কমলে কণ্টক।

উপন্যাস।

শ্রীমণীন্দ্রলাল ঘোষ প্রণীত।



[illegible] চিৎপুর রোড ভারত লাইব্রেরী হইতে
শ্রী [illegible] নিতাই লাল শীল কর্তৃক
প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

সন ১৩০৪ সাল।

মূল্য ১৷৽

কমলে-কণ্টক।

উপন্যাস।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

যে সময়ে মুরসিদাবাদ নগরী মুসলমানদিগের প্রবল পরাক্রম ঘোষণা করিয়া, বঙ্গদেশ মধ্যে অদ্বিতীয় হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সময় কোন কোন দিন গৌড়নগরের শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিয়া ভাগীরথীর তরঙ্গচ্ছলে, কখন হাসিত, কখন নাচিত, বিদ্রূপচ্ছলে কখন কত প্রকার ভাব ভঙ্গী প্রকাশ করিত, কখনও বা পরিণত-যৌবন দিনকরকে বুকে ধরিয়া, আপনার সৌন্দর্য্যাবলোকনে আপনিই ফাটিয়া পড়িত। এইরূপ আনন্দোৎসব দেখিতে একদিন একটী যুবক ও একটী ষোড়শবর্ষীয়া যুবতী সায়ংকালে জাহ্নবী তীরে উপস্থিত। পরস্পর দর্শনমাত্র যুবক বিস্মিত, চকিত, অবাক দণ্ডায়মান; রমণী লজ্জিতা, অধোগ্রীবায় কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বনের পর পদাঙ্গুষ্ঠে ক্ষিতি বিদারণ করিতে লাগিল। প্রদোষ কালে সহকার দলে শিশির পতনের ন্যায় যুবতী পদ-

ধরলগ্ন ভুমি নয়নবারিবিষিক্ত হইতে লাগিল। উভয়েই স্তব্ধ, কেহই মৌন ভঙ্গে ইচ্ছুক নহে। পরিশেষে যুবক মৃদুস্বরে বলিল,—কুসুম আমায় ক্ষমা কর। আমি ভয়ানক পাপী।

কুসুম। মিছে কেন আত্ম ভৎর্সনা কর, তোমার দোষ কোথা, সমস্তই আমার অদৃষ্টের দোষ।

যুবক। বেশী কথা বলিয়া আর আমায় লজ্জা দিও না, সমস্ত কথা মনে হলে প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। ক্ষান্ত হও।

কুসুম। এতদিন পরে দাসীকে ফাঁকি দিবার বেশ পথ বাহির করিযাছ, এ নবীন বয়সে নাকি তীর্থ দর্শনের ইচ্ছা হইযাছে?

যুবক। আমরা ব্রাহ্মণ, তীর্থদর্শন ব্রাহ্মণের প্রধান ধর্ম্ম, কি করি পিতার অনুরোধে স্বীকার করিতে হইয়াছে।

কুসুম। তোমার স্বাস্থ্য, তোমার সুখ, তোমার ধর্ম্মরক্ষা অপেক্ষা আমার জীবন অধিক প্রিয় নহে কিন্তু অল্প কিছুদিন পূর্ব্বের কথা মনে কর দেখি,—

কুসুমের আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। চক্ষের জলে গণ্ডস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

যুবক। আমি তীর্থযাত্রা করিলে তুমি নিশ্চয়ই জানিতে পারিলে, এখনও ঠিক হয় নাই।

কুসুম। আমার জানিবার আবশ্যক ;

যুবক। আমাতে তোমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে বলে।

কুসুম। অধিকার থাকিলে আর তীর্থদর্শনের ছল হইত কি? সকলি অদৃষ্টে করে, বামন কি কখন চন্দ্রের স্পর্শ সুখ ভোগের যোগ্য হয়? আমি কোথা অস্পৃশ্য বণিক কন্যা, আর তুমি হিন্দু কুলতিলক ব্রাহ্মণ পুত্র;—অমূল্য কহিনুরে আর সামান্য কাঁচে, তেজপুঞ্জ তারকাকুল ও সামান্য খদ্যোতিকায় এবং সূর্য্য ও দীপালোকে যেমন প্রভেদ, তোমাতে আমাতে সেইরূপ প্রভেদ। অতএব তোমার প্রণয় আমার স্বপ্ন-কল্পিত।

যুবক। তুমি খেদ করিও না, আমি তোমারি। পৃথিবীতে যদি প্রাণ অপেক্ষা আমার কোন প্রিয়বস্তু থাকে তবে সে "তুমি"। জন্মাবধি তোমার সহিত আমার ভালবাসা, এ ভালবাসা একরূপ স্বভাবতঃ বলিলেও দোষ হয় না, বাল্যকাল হইতে তুমি বণিক-কন্যা ও আমি ব্রাহ্মণপুত্র, এরূপ ভেদ জ্ঞান ছিল না, দিবারাত্রি একত্র থাকিতাম, একত্র খেলিতাম, একত্র খাইতাম। রাত্রিকালে কেবল পৃথক শয্যায় শয়ন করিতাম, কিন্তু তোমার মনে পড়ে একদিন নিদ্রিতা-বস্থায় তোমাকে স্বপ্ন দেখিয়া তোমার নাম ধরিয়া

কাঁদিতে লাগিলাম। মা ব্যস্ত হইয়া আমাকে তোমাদের বাড়ী নিয়ে গিয়ে, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তোমাকে আমাকে একত্র কোলে করে থাকিলে তবে আবার আমার নিদ্রা হয়।

কুসুম। সে সমস্তই মনে আছে, যদি মনে না থাকিত তবে একরকম ভাল হইত। মনে থাকাতেই এ আগুণ জ্বলিতেছে। তুমিই আমার সেই হেমন্ত, আর আমিও তোমার সেই কুসুম, কিন্তু সে একদিন আর—এ একদিন মনে কর দেখি। যে দিন হতভাগিনীকে ফেলিয়া পিতা মাতা ইহলোক হইতে প্রস্থান করিলেন, সে দিন তোমার মা তোমার বাপ না থাকিলে আমি এতদিন কোন্‌কালে তাঁহাদের সঙ্গী হইতাম, আমি কেন জীবিত রহিলাম, তোমার সাক্ষাতে এখনি এ পাপ জীবন বাহির হউক।

হেম। দেখ কুসুম, আমি প্রাণান্তেও তোমার প্রণয়-রত্ন হারাইয়া জীবিত থাকিতে পারিব না।

কুসুম। তবে কিরূপে তীর্থস্থানে থাকিবে?

হেম। তোমার প্রণয় মন্ত্র জপ করিব।

কুসুম। তাহা অপেক্ষা দেশে থাকিয়া সংসার আশ্রম গ্রহণ করা কি ভাল নয়? আপনার মূল কুসুমত বাড়ী ছাড়িয়া আসিয়াছে।

হেম। সংসারী হইলে তোমার কি সুখ হইবে?

কুসুম। ছেলে বেলাকার সুখেই আমার সুখ। তবু দেখে চক্ষু জুড়াবে।

হেম। আমি তাহাতে সুখী হইতে পারিব না।

কুসুম। যদি নিতান্তই তীর্থে যাইবে, তবে কেন দাসীকে সঙ্গে লইয়া চল না।

হেম। যদি সঙ্গে লইবারই ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে স্বদেশ পরিত্যাগ করিতে হইবে কেন?

কুসুম। তবে আমার জন্যই তোমাকে তীর্থবাসী হইতে হইল।

হেম। কোন্ লজ্জায় বলিব?

কুসুম। তবে কেন হতভাগিনীই দেশ ছাড়িয়া যাউক না।

হেম। তাহাতেই বা বাসনা সিদ্ধি কোথা?

কুসুম। সংসারী হইয়া সুখে পিতা মাতার সেবা শুশ্রূষা করিতে পাইবে।

হেম। পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল কই?

কুসুম। সে প্রায়শ্চিত্ত কি দেশ ত্যাগ করিয়া তীর্থবাসী হওয়া?

হেম। তা বই আর কি।

কুসুম। কত দিনের জন্য?

হেম। অল্পদিনের জন্য, তার পরে দেশে আসিয়া জনসমাজে স্থান পাইব।

কুসুম। বোধ হয় তবে শীঘ্রই আবার সাক্ষাৎ হইবে?

হেম। সমাজপতিগণের ব্যবস্থামতে শীঘ্রই প্রত্যাগমনের সম্ভাবনা বটে, কিন্তু আমি যদি কখন তোমাকে এবং তোমার সেই ছেলেবেলার ভালবাসাকে ভুলিতে পারি, তবে দেশে ফিরিব, নতুবা এই পর্য্যন্ত।

হেমন্তকুমার পুরুষ হইলে কি হয়, শেষ কথাটী বলিবার সময় নয়নদ্বয় অশ্রুভারার্দ্র হইল, কুসুমের পানে চাহিয়া থাকিতে পারিল না, মুখ ফিরাইয়া লইল। কুসুম জানিতে পারিল, হেমন্ত সমাজবন্ধনভয়ে তাহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য।

হেমন্তকুমার এই কথার পর কুসুমের সহিত আর পূর্ব্বের মত কথা কহিতে পারিল না, কুসুম দেখিল, হেমন্ত অনেক চেষ্টা করিয়া কণ্ঠনালীর জড়তা নিবারণ করিতে পারিল না, অনেক চেষ্টার পর হেমন্ত আর সেখানে না থাকিয়া নগরাভিমুখে যাত্রা করিল। যতক্ষণ দৃষ্টি চলিল কুসুম একদৃষ্টিতে সেই পথে চাহিয়া রহিল, তাহার পর হেমন্তমূর্ত্তি নগরের জনতার সহিত মিশাইয়া গেল। যুবতী সেই স্থানে দাঁড়াইয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল, বালিকাকালে পিতা মাতার অনেক আদর অনেক যত্নের ধন ছিলাম, উত্তমর্ণের ঋণজালে আবৃত হইয়া শৈশবাবস্থাতেই তাঁহারা এই চিরদুঃখিনীর

মায়া পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গবাসী হইয়াছেন। সংসারে আপনার বলিতে প্রায় কেহই নাই, হেমন্তের সহিত অনেক দিনের ভালবাসা, এজন্য তাহার পিতা মাতা কেবল মুখের আশ্বাস দিতেন, এতদিন প্রতিপালন করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু হেমন্তের সহিত প্রণয় তাহারা দেখিতে পারেন না. প্রাণ থাকিতে হেমন্তও আমায় ছাড়িতে পারিবে না, আমিও হেমন্তকে ছাড়িতে পারিব না, বারম্বার নিষেধ সত্ত্বেও হেমন্তের পিতা মাতা আমাদের মনের ভাব ঠিক জানিতে পারিয়াই, আমাকে বাটী হইতে বিদায় করিয়া দিলেন, এখন আমি নিরাশ্রয়, হেথা সেথা করিয়া আজি কয় দিন কাটাইতেছি, ইহাতেও আমার কষ্ট হইত না, যদি এক এক বার হেমন্তকে দেখিতে পাইতাম, হেমন্তের বাটী হইতে আসিয়া অবধি যে কয়দিন এদিক্ ওদিক্ কাটাইতেছি, সে কয়দিনও গোপনে এক এক বার সাক্ষাৎ করিতে যাইতাম, হেমন্ত আমাকে না দেখিলেও আমি তাহাকে দেখিয়া সুখী হইতাম। আজি হইতে সে আশাও নির্মূল হইতে চলিল। এখন কিরূপে প্রাণ ধারণ করিব, খাবার পরিবার চিন্তা করি না, এখনি কোন গৃহস্থের বাটীতে দাসী থাকিলে অনায়াসে দিনপাত হইয়া যাইবে, কিন্তু হেমন্তের ভালবাসা কোথায় পাইব? ভালবাসার জন্যই হেমন্ত দেশ ছাড়িয়া চলিল।

কুসুমের এ দুঃখের সময়, কত দুর্ভাবনা ভাবিতেছে কিন্তু এ সময় আমোদ আহ্লাদ করা প্রকৃতির নিত্য কর্ম, সুতরাং দিবাকর চুম্বিত ভাগিরথীর সহর্ষোচ্ছ্বাস, তদুপরি শুভ্র ফেণপুঞ্জ নাচিয়া নাচিয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া, খেলাইয়া বেড়াইতেছে। পবনহিল্লোলবাহিত মধুর কোকিল কুজন কাঁপিয়া কাঁপিয়া কর্ণশীতল করিতেছে। জাহ্নবীসলিলসিক্ত পূত মলয় পবন কি ধনী, কি নির্ধন, কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি রাজা, কি প্রজা সকলকেই সমান ভাবে সেবা করিতেছে। কিন্তু কিছুতেই যুবতীর মনে জ্বালা শান্ত হইতেছে না, অনেকক্ষণ পরে সে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল, তাহার সঙ্গে এক ফোঁটা অশ্রু বক্ষে পতিত হইল। সে অশ্রুবিন্দুর চারুতার উপমা নাই, এ নির্জ্জনস্থলে কেহ ছিল না, সুতরাং সে শোভায় কাহারও মন ভুলাইতে পারিল না, কেবল দুর্গম কান্তারমধ্যে কুসুম সৌরভের ন্যায় যেখানকার সেইখানেই মিলিয়া গেল। কুসুম একবার মনে করিল হেমন্তের সঙ্গে যায়, কিন্তু হেমন্ত তাহারই জন্য তীর্থবাসী হইতেছে, পিতার বেস বিষয় আছে, সংসারী হইলে চিরদিন সুখে কাটাইবে, কিন্তু তথাপি তাহার প্রত্যাগমনের আশা অতি অল্প। যদিও হেমন্ত ফেরে, ফিরিল, তাহাতে তাহার কি? যুবতী অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিল তাহার সমস্ত আশা ভরসা নিদাঘ তপ্ত

লতিকার মত কুঞ্চিত হইয়া আসিল। তখন মনে করিল, নদীর জলে প্রবেশ করিয়া শোকসন্তপ্ত জীবন শেষ করে। আবার কতক্ষণ কি ভাবিয়া বলিয়া উঠিল "না মরা হবে না।" সন্ধ্যা হইল, একাকী নদীতীরে থাকিয়া আর কি ফল, এই বলিয়া কুসুম সহরে প্রবেশ করিল।



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অরণ্যমধ্যে।

হেমন্ত, কুসুমের মায়া কাটাইবার জন্য অধিকক্ষণ তাহার নিকট না থাকিয়া চলিয়া আসিল বটে, কিন্তু তাহার মন কুসুমকে ভুলিতে পারিল না, আহারকালে বোধ হইতে লাগিল যেন কুসুম পূর্ব্বের ন্যায় তাহার আহার দর্শন করিতেছে, মনোগত ভাব অন্যকে লুকাইবার জন্য যেন এক এক বার এদিক ওদিক করিতেছে কুসুম নিকটে থাকিলে আহারকালে হেমন্তের যে সুখ হইত, এখন যদিও তাহার সেই সহাস্য বদন ও মৃদুমন্থর গমন, যেন তিনি দেখিতে পাইতেছিলেন, কিন্তু হ'লে কি হয়, প্রকৃত বস্তু হইতে তাহার অনুকৃতির অনেক প্রভেদ। সে অনুকৃতিও আবার প্রত্যক্ষ নহে, মনের কল্পনামাত্র, যাহা হউক আহারে অসুখ জন্মিল, অনিচ্ছা হইল। আহারের পর শয়ন,—শয়নের পর নিদ্রার উপাসনা ব্যর্থ হইল। বলপূর্ব্বক চক্ষু মুদ্রিত করিলে

হইবে কি মনের ভিতর কুসুমের চিত্র অবিকল প্রতি-বিম্বিত হইতে লাগিল। এইরূপে তিন দিন অতীত হইল, কিন্তু কোন উপায় হইল না। শেষে হেমন্ত কুমার গৃহ ত্যাগ করিয়া তীর্থযাত্রা করিলেন, গমনকালে মনের ক্ষোভে পিতা মাতাকে জানাইয়া গেলেন না। গৃহ হইতে কখন অন্যত্র গমন করেন নাই, সুতরাং এক দিনের পথ ছয় দিবসে ঘুরিয়া নানা স্থান দেখিতে দেখিতে প্রায় পঁচিশ দিন পরে দেবঘরের নিকটস্থ একটী বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন, এই স্থান হইতে বৈদ্য-নাথ তীর্থ প্রায় ছয় ক্রোশ। হেমন্তের ইচ্ছা যে তিনি তত্রত্য অনাদিলিঙ্গ মহাদেব মূর্ত্তির পূজা করিয়া বারা-ণসী ধামে গমন করিবেন।

শরৎকাল; বেলা প্রায় দুই প্রহর অতীত, আকাশ কখন নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন হইয়া অবিরল ধারায় বৃষ্টি পতিত হইতেছে, কখন বা নির্ম্মল ভাব ধারণ করিয়া খররশ্মি দিবাকর উদিত হইয়া জগৎকে হাসাইতেছে। অদূরে নির্ঝরচয় চিরসঞ্চারী মধুর শব্দে মুক্তাকলাপ উদ্গীরণ করিয়া বনচারী ব্যক্তিগণের কর্ণ জুড়াইতেছে। কোথায় শিখীসহ শিখিনীগণ সগর্ব্বে ধরায় পদাঘাত করিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে। চতুর্দ্দিকস্থ তৃণময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূখণ্ডে, হরিণীগণ শাবকসহ তাহাতে চরিয়া বেড়াই-তেছে, কোন কোনটী সবুজ তৃণোপরে অঙ্গ ছড়াইয়া

উর্দ্ধপদে ক্রীড়া করিতেছে। পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষুদ্র ভূধরচূড়ায় শৃঙ্গ বন্য ছাগসমূহ লাফাইতেছে। যদিও অরণ্য, কিন্তু এই সমুদায় তৃণভোজী জন্তুগণের যথেচ্ছা বিহার দৃষ্টে, হিংস্র পশুগণের বাসভূমি বলিয়া পথিকের কোন মতে উপলব্ধি হইল না, সুতরাং নির্ভয়ে চলিতে লাগিলেন। কিছু দূর গিয়া দেখিতে পাইলেন ঝাঁকে ঝাঁকে মধুমক্ষি উড়িয়া আসিতেছে এবং সেই জনহীন প্রদেশে ভ্রমর গুঞ্জন, বিবিধ জলচর বিহঙ্গমদিগের কল নিনাদ কর্ণগোচর হইতে লাগিল। পবনহিল্লোলপূর্ণ করিয়া কমল সৌরভ নাসিকাকে তৃপ্ত করিতেছিল, এই সকল লক্ষণে হেমন্ত বুঝিতে পারিলেন যে অদূরে কোন জলাশয় আছে, বেলাও অতিরিক্ত হইয়াছিল, অতএব স্নানাভিলাষে তিনি সেই জলাশয় সমীপে গমন করিলেন।

গিয়া দেখেন এক রম্য সরোবর! জলের বর্ণ কাক চক্ষুর ন্যায়, তাহাতে রাশি রাশি কমল বিকশিত হইয়া সরোবর আচ্ছন্ন করিয়াছে, তদুপরি ভ্রমরগণ উড়িয়া অপূর্ব্ব শোভাবর্দ্ধন করিতেছে, দেখিবামাত্র যুবক হেমন্তকুমারের মন ভুলিয়া গেল এবং দেশ ভ্রমণ জনিত শারিরীক শান্তি বিদূরিত হইল। তখন সর্ব্বশরীর স্বেদার্দ্র, হঠাৎ অবগাহন করিলে পাছে কোন অসুখ হয় এজন্য তাঁহাকে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া শরীর স্নিগ্ধ

করিবার জন্য অবকাশ লইতে হইয়াছিল। তিনি এক তরুতলে উপবেশন করিয়া সরোবরের মনোহারিত্ব দেখিতে ছিলেন, কমলকলিতে ভ্রমরবিহার, সমীরণ স্পর্শে নলিনীদলের সুমন্দ আন্দোলন আর কমলিনী হৃদয়ে শরৎকালীন মধ্যাহ্নসূর্য্যের শোভা দেখিতে দেখিতে জগতের নিয়ত পরিবর্ত্তনশীলতা চিন্তা করিতে-ছিলেন, এমন সময় পশ্চাতে বৃক্ষপত্রের পতন শব্দে চকিত হইয়া চক্ষু ফিরাইবামাত্র দৃষ্টি করিলেন, তাহার পার্শ্ববর্ত্তী লতাকুঞ্জে একটী মোহিনী মূর্ত্তি দণ্ডায়মান, বামহস্তে একটী বৃক্ষশাখা অবলম্বন, দেখিবামাত্র তিনি বিস্মিত হইলেন। বিজন অথচ, চতুর্দ্দিকে মানব সমা-গম নাই, বেলা প্রায় দুই প্রহর, এরূপ সময় এই দুর্গম স্থানে স্ত্রীলোকের আগমন নিতান্ত অসম্ভব, সুতরাং হেমন্ত কুমারের মনে পুরাণ পঠিত বনদেবী বলিয়া সন্দেহ জন্মিল। বয়স পনর কি ষোল রূপ প্রভায় দিক আলোকিত, তাহার রূপের নিকট যেন সূর্য্য কিরণ মলিন বোধ হইল, বদন চন্দ্রের অলৌকিক মাধুরী অতি রমনীয়, শশধর চিরদিন কলঙ্কিত, সৃষ্টির আদি অবধি মৃগ কোলে বরাবর কাঁদিয়া আসিতেছেন, মৃগের জন্যই চন্দ্র কলঙ্কী, পৃথিবী মধ্যে এই যুবতীর নিকট সুধাংশুকে পাইয়া মৃগবর বুঝি আপন চক্ষু দুইটী দিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছে। মস্তকের নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ কেশরাশি

নিতম্ব পর্য্যন্ত লম্বিত, তৈল বিনা রুক্ষ ও চমরী পুচ্ছের ন্যায় পরস্পর বিশ্লিষ্ট, নয়নদ্বয় অচঞ্চল, যেন স্থির খঞ্জন দুটীতে অমায়িকতার চিত্র অঙ্কিত। গণ্ডদ্বয় লজ্জা প্রভাবে রক্তিমবর্ণে রঞ্জিত। নিবিড় নিতম্বদেশ, কটী-দেশ এতাদৃশ ক্ষীণ যে, দেখিলে বোধ হয় যেন সেই কটীদেশ ভারবহনে অক্ষম। সুললিত বাহুযুগের স্ফুট-নোন্মুখ চম্পক কলিকার ন্যায় অঙ্গুলিচয় সুন্দর বরাঙ্গে কি মনোহর শোভা পাইতেছে! এমন সুন্দরী মূর্ত্তি কিন্তু নিরলঙ্কারা, কেবল মাত্র গলে রুদ্রাক্ষ মালা, আকার ইঙ্গিতে হেমন্ত কুমার জানিতে পারিলেন যে এ স্ত্রীরত্নটী কোন গৃহস্থের। হেমন্তের ভ্রম কবা দূরে গেল কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পরে তিনি বিনয় পূর্ব্বক কহিলেন "আপনি কে? এবং কেনই বা একাকিনী নিবিড় বন-মধ্যে যদৃচ্ছা ভ্রমণ করিতে শঙ্কা করিতেছেন না?" যদি কোন আপত্তি না থাকে ত পরিচয় বলিলে পরম বাধিত হইব এই কথা শ্রবণ করিয়া কামিনী লজ্জিতা, হইলেন, সুতরাং বিনম্রবদনা হইলেন, লজ্জাবতী লতাকে কে যেন স্পর্শ করিল, কোন উত্তর দিলেন না।—হেমন্ত আর অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে না পারিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন "ভাবে বুঝা যাইতেছে, পরিচয়দানে বোধ হয় আপনার বিশেষ আপত্তি আছে?"

যুবতী লজ্জিতা হইয়া উত্তর করিলেন, "সেরূপ

হইলে এতক্ষণ দেখিতে পাইতেন না” হেমন্ত এই কথা গুলি বীণা শব্দে শুনিতে পাইলেন বটে কিন্তু অধর ওষ্ঠ সঞ্চালন দেখিতে পাইলেন না।

হেমন্ত। তবে বিলম্ব করিয়া প্রশ্নকর্ত্তার চিত্ত চকোরের তৃষ্ণা বৃদ্ধি করিবার কারণ কি?

যুবতী। অন্য কারণ কিছুই নাই, তবে মনুষ্য মাত্রেরই ইতিবৃত্ত সুখ দুঃখের বর্ণনা পত্র মাত্র। আমার পূর্ব্বকথা অতি অদ্ভুত, শোচনীয়, হৃদ্বিদারক এবং বর্ত্তমান দশা অত্যন্ত ঘৃণিত, ও অশ্রোতব্য। আমার দুঃখের কথা শুনিয়া অনর্থক একজন অপরিচিতের মনে বিষাদের আবির্ভাব হয়, অতএব পরিচয় প্রদানে অক্ষম।

হেমন্ত। জিজ্ঞাসু সমবেদনায় ব্যথিত হইলে দুঃখের বিবরণ যতই মন্দ হউক না প্রকাশ করিতে বাধা নাই, এবং এরূপ করিলে মনোবেদনারও অনেক লাঘব হইয়া থাকে। অবস্থা এবং পাত্র বিশেষে শ্রোতা তাহার প্রতিকারেরও উপায় হইতে পারে।

যুবতী। একজন অসহায় আরণ্যনিবাসিনীর প্রতি এতাদৃশ অযাচিত অনুগ্রহ অল্প সৌভাগ্যের কথা নহে।

যুবতীর সহিত হেমন্ত কুমারের কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় একজন বিকটাকার ভীষণ পুরুষ সক্রোধে তাঁহাদিগের নিকটে আসিতেছে দেখা গেল

যুবতী এই ভীষণ মূর্ত্তিকে দেখিয়া ভীতা হইলেন, এবং সভীতবে হেমন্ত কুমারকে কহিলেন "মহাশয়। কি অশুভক্ষণেই আমার সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইল, পূর্ব্ব জন্মের দারুণ দুষ্কৃতি ফলে ইহজন্মে স্বয়ং এই দুঃসহ যাতনা ভোগ করিতেছি, আবার ব্রহ্মহত্যার পাতকিনী হইলাম, নরপিশাচ দেখিতে পাইলে আপনাকে ও আমাকে বাঁচাইবে না, মনে বড় ভয় হইতেছে। মহাশয়! অদ্য আমি চলিলাম, একপক্ষ মধ্যে দাসীর প্রতি কৃপা করিয়া এই স্থানে আসিবেন, আপনিই আমার একমাত্র ভরসা, এখন বিদায় হই, আর যদি ঐ নরপিশাচ এদিকে আইসে তবে যতক্ষণ না আমার সহিত প্রস্থান করে ততক্ষণ আপনি ঐ লতাকুঞ্জে লুক্কায়িত থাকুন, আমি অগ্রসর হইতেছি উহাকে এখান পর্য্যন্ত আসিতে দিব না, কিন্তু নিবেদন পনর দিন মধ্যে যদি না আইসেন তবে স্ত্রীহত্যার পাপ আপনাকে অর্শিবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বৈদ্যনাথ।

হেমন্ত কুমারের নিকট বিদায় লইয়া সেই অপরিচিতা মিষ্টভাষিনী যুবতী দ্রুতপদে চলিলেন, কিছুদূর যান আর শ্বাসযন্ত্রের চঞ্চল ক্রিয়ায় হাঁপাইয়া উঠেন আবার মৃদুগমন করেন আবার দৌড়ান, এইরূপে চলিতে লাগিলেন, যুবতীর মনে বিষম ভয় পাছে দুষ্ট নিকটে আসিয়া হেমন্ত কুমারের কোন অনিষ্ট করে। হেমন্ত কুমার যদিও সেকালের ব্রাহ্মণপুত্র তথাপি নিতান্ত ভীরু নহেন, অত্যন্ত বল ছিল, সুতরাং যুবতীর কথায় ভয় না পাইয়া, তাহার কথা মত অলক্ষিতে থাকিয়া সমস্তই দেখিতে লাগিলেন, কামিনী নিকটে যাইবামাত্র সেই ভীমকায় পুরুষ যুবতীর কেশাকর্ষণ করিয়া বিকটস্বরে বলিয়া উঠিল "পাপিয়সী। প্রাতঃকালে পুষ্পচয়নের জন্য আশ্রম ছাড়িয়া আসিয়াছিস্, মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত এখনও যদৃচ্ছা বেড়াইতেছিস্,

স্বামীজি প্রভু ক্রোধিত হইয়াছেন, আজি রাত্রিতেই তোকে যোগমায়ার নিকটে বলিদান দিবেন।

একজন বলবিক্রমশালী সাহসী পুরুষের সাক্ষাতে অসহায়া ষোড়শীর প্রতি অত্যাচার নিতান্ত অসহনীয়। দর্শনমাত্র হেমন্তের শরীর ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল, বহ্নি-সহ যেন বায়ুর সাক্ষাৎ হইল। হৃৎপিণ্ডে রক্তস্রোত প্রবলবেগে বহিতে লাগিল, তাহার নিতান্ত ইচ্ছা যে তদ্দণ্ডে দুরাত্মার সম্মুখীন হইয়া তাহার প্রতিফল প্রদান করেন, কিন্তু এই ব্যক্তির সহিত যুবতীর সম্বন্ধ কি, তাহার প্রতি অত্যাচারে যুবতীর যদি ক্ষতি হয়, এই সাত পাঁচ ভাবিয়া তাহাতে ক্ষান্ত হইলেন। চারিদিকে নিবিড় বন, অল্পক্ষণ মধ্যে তাহারা অদৃশ্য হইল, কোন্ দিকে গেল হেমন্ত দেখিতে পাইলেন না।

বেলা অত্যন্ত অধিক হইয়া পড়িয়াছে, স্নানের কথা দূরে থাকুক আহার করিবার সময়ও উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। হেমন্তের মনে চিন্তার বেগ বাড়িতে লাগিল তিনি স্নান করিলেন, এবং তদ্দেশ সুলভ ফল মূল আহার করিলেন। এখন তাঁহার চিন্তা এই যে কিরূপে এই বিজন কাননে এক পক্ষকাল একাকী অতিবাহিত করেন, যুবতী কোথায় গেলেন, কি করিবেন এখানে থাকিলে সাক্ষাৎ মিলিবে কি না কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া তিনি বৈদ্যনাথ তীর্থ দর্শনার্থে এই স্থান

ত্যাগ করিয়া গমন করিলেন। পনর দিন পরে যুবতীর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, ইহাই অবধারিত হইল। পূর্ব্বেই পাঠককে বলিয়াছি এই বন হইতে বৈদ্যনাথ তীর্থ কিছু কম বেশী ছয় ক্রোশ হইবে। একে অপরিচিত দেশ তায় অরণ্যময়, বৃক্ষ, লতা, গুল্মসঙ্কুল স্থান, রীতিমত রাস্তা নাই এজন্য বৈদ্যনাথ পৌছিতে তাহার সে দিন সমস্ত বেলা এবং তাহার পর দিবস এক প্রহর অতিবাহিত হইয়াছিল।

বৈদ্যনাথ মহা তীর্থ, প্রবাদ এই যে লঙ্কাপুরীর কুশল কামনায় মহাবীর রাবণ কৈলাসশিখর হইতে শঙ্করকে আনয়ন কালে দৈব প্রতিকূলতায় এই স্থানে সংস্থাপিত করিয়া যান। স্থানটী অত্যন্ত মনোহর নিকটে কতকগুলি ক্ষুদ্র শৈলের নিম্নে ছোট ছোট বৃক্ষে পরিপূর্ণ কয়েকটী জঙ্গল অতি শোভাময়। তীর্থ স্থানটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, মহাদেবের মন্দিরটী পুরাতন প্রণালীতে রচিত, দেওয়ালে নানা মূর্ত্তি খোদিত, শৈব সন্ন্যাসীগণ দলে দলে তথায় আগমন করিতেছে, একটী ক্ষুদ্র সহরে যাত্রীদিগের আবাস স্থান ব্যতীত তদতিরিক্ত আর কিছুই নাই।

এই রম্য তীর্থে হেমন্ত কুমার বার দিন অতিবাহিত করিয়াছেন ত্রয়োদশ দিবসে সন্ন্যাসী দলে বেষ্টিত হইয়া শিব স্তোত্র পাঠ করিতেছেন, তখন বেলা প্রায়

দুই প্রহর. মনের আনন্দে স্তোত্র পাঠ চলিতেছে। এমন সময় কতকগুলি বালক উচ্চরবে বলিয়া উঠিল পাগলী! পাগলী! কিছু পরেই বালকেরা পাগলীকে বেষ্টন করিয়া সন্ন্যাসীদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইল। পাগলীর রূপ অলৌকিক, দেহের যত্ন নাই, যেন কর্দ্দমশিক্ত অমূল্য রত্ন, পাঠক এ অবস্থায় পাগলিনীর রূপ বর্ণনে আমরা কোন ক্রমেই ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। পাগলিনীর দেহ মাপে পুরা চৌদ্দ পুয়া, সচরাচর যে রূপ স্থূল হইলে স্ত্রীলোককে কদাকার দেখায় পাগলিনী সেরূপ স্থূলাঙ্গী নহে। দেহ খানি বেশ দোহারা, কটি দেশ ক্ষীণ, সুগঠিত কুচ যুগল কি মনোহর! করতল অলক্তরাগে রঞ্জিত, সুগোল গলদেশের কণ্ঠাস্থি নিম-গত হইবার নহে, চক্ষুদ্বয় কৃষ্ণবর্ণ, অচঞ্চল, আকর্ণ বিস্তৃত, ঈষৎ বঙ্কিম আভাযুক্ত, অধর ও ওষ্ঠ দাড়িম্বের ন্যায় অকৃত্রিম জ্যোতিঃবিশিষ্ট, ললাট দেশ যেরূপ প্রশস্ত হইলে পুরুষের শোভা ও সৌভাগ্যের লক্ষণ হয়, ইহা সেরূপ নহে, ভ্রূযুগ হইতে উর্দ্ধ সংখ্যা তিন অঙ্গুল বিস্তৃত, শিরে রুক্ষ নিবিড় কেশ রাশি নিতম্ব পর্য্যন্ত লম্বিত, পাগলীর বয়স কোন মতে অষ্টাদশের অধিক হইবে না। পাগলী কখন হাসিতেছে, কখন নাচিতেছে কখন বা উচ্চরবে কাঁদিতেছে। পাগলীর হাসিতে চপলতা, নয়ন অকপট আনন্দ প্রকাশ করিতেছে, আর

রোদনে জগৎ কাঁদাইতেছে। সে রোদন শ্রোতার অস্থি ভেদী এবং মর্ম্মভেদী, সেখানে যত লোক ছিল, সকলেই আপনার মত কথা কহিয়া পাগলীর সহিত আমোদ করিতে লাগিল। কিন্তু পাগলী এই কথা বলিয়া বেড়াইতেছিল "শেষে কি হবে?" যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে "পাগলী! কিসের কি হবে?" পাগলী উত্তর দিল "এই অসার দেহের, এ ছার যৌবনের, এই পৃথিবীর, ঐ আকাশের এবং অন্য প্রিয়তম বস্তুর। তাহার এই কথায় কেহ বা হাস্যচ্ছলে কহিল তোর যা হবার হইয়াছে, পাগলী তখনি উত্তর দেয় "আমি যা তাই আছি" কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিল "পাগলী! তোর বিয়ে হয়েছে?"

পাগলী। হয়েছে।

প্রশ্ন। কার সঙ্গে?

পাগলী। চাঁদের সঙ্গে।

প্রশ্ন। তবে এখানে কেন?

পাগলী। চাঁদ খুজ্‌চি। কিন্তু আমার সেই চাঁদকে দেখ্‌তে পাচ্চিনা।

প্রশ্ন। চাঁদ কি পৃথিবীতে থাকে, দূর পাগলী! চাদের সঙ্গে কখন মানুষের বিয়ে হয়? যে ক্ষেপা সেই ক্ষেপা।

পাগলী। না গো না সত্যি, ছেলেবেলা হতে

তাঁহার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে, দেখ গা আমি সেই চাঁদ খানিকে ছেলেবেলা হইতে দেখ্‌তাম, দিন উঠতো দেখ তার প্রায় কখন অস্ত হইত না। আর দেখ সে যে দিকে যাইত, সেই দিক্ আলো হইত; কি দিন কি রাত্রি আমার দেহ জুড়াইত।

প্রশ্ন। তার পর সে চাঁদ কোথা গেল?

পাগলী। কোথায় গেল বল্‌তে পারি না। কেমন করেই বলি চারিদিক অন্ধকার। হাঁ গা তোমরা কখন বল রৌদ্রের জ্বালায় বাহির হওয়া যায় না, কখন বল রাত্রিটী বেশ শীতল, মনোহর কেমন চন্দ্র উদয় হয়েছে! তোমাদের কথা সকলি মিথ্যা।

হেমন্ত কুমার স্তোত্র পাঠে অন্যমনস্ক ছিলেন পাগলিনীর কথায় কর্ণপাত করেন নাই, ক্ষণেক পরে তাহাকে দেখিয়া চকিত, বিস্মিত ও দুঃখিত হইলেন কিন্তু মনের ভাব মনেই রহিল, লজ্জা হইল, মন খুলিয়া পাগ্‌লীকে দুকথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না। হেমন্তকুমারকে দেখিয়া পাগ্‌লী সেখানে বসিল, অনেক ক্ষণ এক দৃষ্টে হেমন্তের মুখপানে চাহিয়া রহিল, পাগল তাই কিছু বলিতে পারিল না, মনে হয় না হলে কিছু তাহার বলিবার ছিল, তাহা মুখের ভাবে বেশ জানা গেল। আহারের সময় হইল, হেমন্ত আহার করিতে গেলেন, কিন্তু বিমনা, এক বার যান, আবার ফিরিয়া

দেখেন, পাগলী কি করিতেছে, কোথায় গেল, এক এক বার ভাবেন পাগলীকে দেখিয়া মন এত ব্যথিত হইল কেন, কিছুই জানেন না; তিনি স্বয়ং ব্রাহ্মণকুমার তায় তীর্থবাসী, একজন অপরিচিতা, তায় উন্মাদিনী, স্ত্রীলোককে দেখিয়া এত বিমনা হইবার কারণ কিছুই ছিল না।

পাগলিনীকে ভুলিবার জন্য কার্য্যে মন দিলেন, মন ভুলিল না, কাজ করেন আর অন্যমনা হন। আহার করিতে বসিলেন, দুই এক গ্রাস খাইয়া বসিয়া রহিলেন, ক্ষণেক পরে মনে হইল আহার করিতে বসিয়াছেন, আবার আহার করিতে আরম্ভ করিলেন, দুই এক বার গ্রাস গ্রহণের পর একটী গ্রাস অন্ন হস্তে, স্থির। কোন কথাটী নাই! পাগলী হেমন্তকে পাগল করিল। আহার ভাল হইল না, জলপানেই উদর পূর্ণ হইয়া গেল, উঠিলেন উঠিয়া আচমন করিলেন। আচমনের পর পুষ্করিণীর ঘাট, দেবমন্দির, সন্ন্যাসীদিগের নিকট পরিশেষে প্রত্যেক অরণ্য তন্নতন্ন করিয়া অন্বেষণ করিলেন, পাগলী কোথায় নাই, যেন বিদ্যুতের মত মেঘ হইতে দেখা দিয়া মেঘে লুকাইল; ক্রমে সন্ধ্যা হইল। বৈদ্যনাথ মন্দিরে প্রবেশ করিয়া হেমন্ত সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপ্ত করিলেন, প্রত্যাগমনকালে সাষ্টাঙ্গে বৈদ্যনাথকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। অতি কষ্টে রাত্রি

প্রভাত হইল; চৌদ্দ দিবস হইল দেওঘরের পথে অপরিচিতা যুবতী দিব্য দিয়া কল্য সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন, না যাইলে স্ত্রীহত্যার পাতকী হইতে হইবে; সেজন্য রাত্রি প্রভাতমাত্র অরণ্য অভিমুখে গমন করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—※—

বিজনে আলাপ।

হেমন্ত অন্যমনা, চিন্তিত, এ কারণ এক দণ্ডের পথ যাইতে এক ঘণ্টা লাগিল; বেলা দ্বিপ্রহর দিক্‌সকল সূর্য্য কিরণে হাসিতেছে। অরণ্য নিস্তব্ধ;—হেমন্ত নির্দ্দিষ্টস্থানে উপস্থিত হইলেন; সেই পুষ্করিণী তীরে, সেই প্রস্তরগ্রথিত সোপানশ্রেণী দিয়া সরোবরের জলে হস্তপদাদি ধৌত করিবার ইচ্ছায় যেমন নীচে নামিতেছেন, এমন সময় সোপানের মধ্যভাগে এক খণ্ড পত্র দৃষ্টিগোচর হইল, এই নিবিড় বন মধ্যবর্ত্তী জনশূন্য সরোবর,—এমতস্থলে হেমন্ত কাগজ দৃষ্টে সকৌতুকে তাহা কুড়াইয়া লইলেন, খুলিয়া দেখিলেন, একখানি লিপি, যত্ন পূর্ব্বক পাঠ করিলেন, তাহাতে লেখা এই "মহাত্মন্! আজি দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে এইস্থানে যে অপরিচিতা যুবতীর সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, আপনার অদর্শনে এক্ষণে সে জীবন্মৃত, অধিনীর জীবন যেরূপ পরাধীন, তাহাতে কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে

ইচ্ছা হইলেই যে আপনার সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারিবিব এমন আশা নাই। অতএব অনুগ্রহ পূর্ব্বক অদ্য সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলে অধিনীর জীবন দান করা হয়। অধিক লেখা বাহুল্য, নিবেদন মিতি।

পত্র পাঠে হেমন্তের মুখে একটু হাসি দেখা দিল. হাসির কারণ এই যে, অপরিচিতা রমণী একবার মাত্র দর্শনেই তাঁহার প্রণয়প্রার্থিনী, অথচ কুসুমের শিশু-কালীন অকৃত্রিম প্রণয়-কুসুমের সৌরভামোদে তাঁহার মন-মধুকর এখনও উন্মত্ত,—সেই হাসি রশ্মিসহ ঘোরতর মেঘাবৃত দিবায় হঠাৎ সূর্য্যরশ্মি প্রকাশের ন্যায়,—তিনি বৃক্ষমূলে শয়ন করিয়া অরণ্যশোভা অবলোকন করিতেছেন, ক্রমে বৃক্ষপত্রের মন্দ মন্দ সঞ্চালন শব্দে এবং দক্ষিণানিল সেবায় সত্বর তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইল। একে বিপুল পথশ্রম, তায় আবার এরূপ সুখসেবা সংস্পৃষ্ট তিনি গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলেন; ক্রমে দিবাসান হইল; পূর্ব্বদিনের অপরি-চিতা কামিনী শশব্যস্তে পুরসীকূলে আসিয়া উপস্থিত হইলে বৃক্ষমূলশায়ী নিদ্রিত হেমন্তকুমারকে দেখিতে পাইলেন, এবং অবিলম্বে সেই বৃক্ষতলে গমন করিয়া দেখেন যে, হেমন্ত নিদ্রিত, অস্তাচল গমনোদ্যোগী তীর্য্যগপথগামী রবিকিরণ তাঁহার গণ্ডস্থলে পতিত হওয়ায় সেইস্থান সায়ংকালীন ম্লান নলিনীদল গত

শিশির বিন্দুর ন্যায় দেখাইতেছিল। চারিদিকে মনুষ্যের গতি বিধি নাই, সুতরাং নীরব, কেবল শাখাচারী বিহঙ্গমদল বৈতালিক গীতে মত্ত হইয়া শাখা হইতে শাখান্তরে গমন করিতেছে, মৃদু পবনহিল্লোলে বক্ষস্থল স্ফীত করিয়া সরোবর সলিল নাচিতেছিল, কখন কখন আপনার পথে আপনি দৌড়িতেছিল, সূর্য্যকিরণে হেমন্তের বদন মলিন দেখিয়া স্বীয় অঞ্চল বিস্তারে আতপ নিবারণ করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন; কিয়ৎক্ষণ পরে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিবার সময় যুবতীর দিকে হেমন্তের দৃষ্টি পড়িল; চারি চক্ষে মিলনমাত্র কামিনী অধোগ্রীবা, হেমন্ত জাগ্রত হইয়া উঠিলেন, উঠিয়া চক্ষু মার্জ্জনা করিতে করিতে কহিলেন, অপরিচিতের প্রতি এতাদৃশ অনুগ্রহ কেন?

যুবতী। (মৃদুস্বরে) এ কথায় অধিনীর অপরাধ স্পর্শে।

হেমন্ত। সে সামান্য দোষ মার্জ্জনীয়।

যুবতী। এই কয়েক দিবসে মহাশয়ের সমস্ত কুশল?

হেমন্ত। সমস্ত কুশল, কিন্তু আপনাকে যেরূপ দুরাচারের হস্তে ফেলিয়া দুর্দ্দশান্বিত করিয়া গিয়াছিলাম, সেই চিন্তায় কয়েক দিবস মনে বড় যাতনা পাইয়াছি। এক মুহূর্ত্তের জন্যও সুখী হইতে পারি নাই।

যুবতী। যাহা দেখিয়াছেন, তাহার সহিত দৈনিক অত্যাচারের তুলনা করিলে, বোধ হয় গোষ্পদ ও মহা-

সমুদ্রে, আলবাল ও হিমালয়শৃঙ্গে তৃণ এবং মহীরুহে যাদৃশ প্রভেদ ইহাও সেইরূপ জানিনা কোন্ দুষ্কর্ম্মের ফলে এত দুর্গতি। রমণীকুলে আমার মত হতভাগিনী কেহ নাই।

হেমন্ত। ইচ্ছা করিলে আমি অনায়াসেই দুর্ব্বৃত্তের সমুচিত শাস্তি প্রদান করিতে পারিতাম।

যুবতী। ভালই করিয়াছেন;—তাহা হইলে আমরা দুই জনেই প্রাণ হারাইতাম, সেই জন্যই আপনাকে নিষেধ করিয়া গিয়াছিলাম।

হেমন্ত। কেন? সে কে? তাহার দীর্ঘ-প্রস্থ দেহকে কি ভয় করি? না তাহার রক্তজবা সদৃশ চক্ষু দেখিয়া এ বক্ষস্থল কম্পিত হয়? সে যেই হউক সে দিন তাহাকে যমালয়ে পাঠাইতাম। নৃশংস! জানেনা,—রমণীর উপর এত অত্যাচার।

যুবতী। আপনি আমার জীবনের একমাত্র সহায় আপনিই আমার এই বিপদ বারিধি পার হইবার একমাত্র অবলম্বন, লতিকাকে ভূলুণ্ঠিতা দেখিয়া তরু কি মনে কষ্ট বোধ করে না? ক্ষণপ্রভা হৃদয হইতে বহির্গত হইলে তাহার স্বামী বারিদ কতক্ষণ তাহাকে বাহিরে থাকিতে দেয়?

হেমন্ত। আপনি অধীরা হইবেন না, আপনার মত অসহায় কামিনীর দুরবস্থা দর্শনে মমবেদনায় ব্যথিত হওয়া মানবমনের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম।

যুবতী। আমি স্ত্রীলোক, বহু বাক্যব্যয়ে চপলতা প্রকাশ করিতে লজ্জা বোধ করি, তবে একমাত্র প্রার্থনা—যেন অধিনীর প্রতি অনুগ্রহ থাকে।

হেমন্তকুমার দেখিলেন, যুবতী তাঁহাতে একান্ত অনুরাগিনী, অথচ তিনি তখনও কুসুমের প্রণয় ভুলিতে পারেন নাই। কুসুমকে না পাইলে তাঁহার জীবনের সুখ অসুখ উভয়ই তুল্য,এ সংস্কার তখনও তাঁহার মন হইতে অন্তর্হিত হয় নাই,—আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইলে যেমন দিনকরের মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হয় না, অথচ রাত্রির ন্যায় অন্ধকারও মেদিনী আচ্ছন্ন করিতে পারে না, হেমন্ত-মনে কুসুমের রূপ সেইরূপে বিরাজ করিতেছিল। যুবতীর কথাবার্ত্তায় একবারেই হেমন্তকে তাঁহার প্রণয় প্রয়াসী করিতে পারে নাই। তবে এ কথা নিশ্চয়ই বলা যাইতে পারে, যে তিনি যুবতীর সরলতা এবং অমায়িকতায় তাঁহার উপকার করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন।

হেমন্ত। পূর্ব্বের প্রতিশ্রুতি পালনে বিমুখী কেন?

কামিনী। প্রতিশ্রুতি কি?

হেমন্ত। পরিচয় দান?

কামিনী। তবে নিতান্তই বলিতে হইবে, আচ্ছা শ্রবণ করুন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

যুবতীর পরিচয় দান।

বর্দ্ধমানের প্রায় দ্বাদশ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্বাংশে দামোদর তীরে আলাটী নামে একটী রাজধানী আছে। প্রায় ছয় শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে তথায় রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক রাঢীয় ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, যখন দিল্লীর সম্রাট বিখ্যাত পাঠাননায়ক আলাউদ্দীন বঙ্গদেশ খণ্ড অধিকার জন্য বাঙ্গালার দক্ষিণ দিক দিয়া তদানীন্তন রাজধানী পরাজয় উদ্দেশে গমন করেন, তৎকালে পথিমধ্যে তাঁহার সেনাগণ ক্লান্ত ও খাদ্যকষ্টে পতিত হওয়ায় উক্ত চক্রবর্ত্তী তাঁহার যথেষ্ট সাহায্য করেন, এইরূপ আতিথ্যসৎকারে প্রীত হইয়া সম্রাট তাঁহাকে রাজা উপাধি প্রদানপূর্ব্বক আলাটীর চতুর্দ্দিকস্থ যাবতীয় ভূভাগের অধীশ্বর করিয়া বাঙ্গালার রাজধানী গৌড় নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যথাকালে রামচন্দ্রের পরলোক প্রাপ্তি হয়, তদীয় বংশধর জীবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী রাজ্যশাসনে আয়ুষ্কাল পূর্ণ করিলে, তাঁহার আত্মজ

রাজা হরিহর চক্রবর্ত্তী সিংহাসনে অধিরূঢ় হয়েন। তাঁহার প্রভাবতী ও কিরণকুমারী নাম্নী দুই কন্যা এবং একটী পুত্র জন্মে, হতভাগিনী তাঁহার প্রভাবতী নাম্নী জ্যেষ্ঠা কন্যা অপর একটী ভগ্নী ও ভ্রাতা শিশুকালেই কালের করাল কবলে নিহত হয়। এই হতভাগিনীই এখন পিতা মাতার একমাত্র কন্যা। আদর করিয়া কেহ কেহ শ্রীমতী বলিয়াও ডাকিত। পিতার অন্য অপত্য না থাকায় বাল্যকালাবধি বড় আদরের ছিলাম, সারাদিন কোলে কোলে ফিরিতাম, পদাঙ্গুষ্ঠে কখনও মৃত্তিকা স্পর্শ করিতাম না। ক্ষুধার সময় কেবল জননীকে দেখিতে পাইতাম; সামান্য দাস দাসী হইতে রাজমন্ত্রী পর্য্যন্ত সকলেই আদর করিয়া আমাকে কোলে লইতেন। এই প্রকারে বাল্যকাল অতিবাহিত হইল পরে পিতা আমাকে পাঠশালায় দিলেন, রাজবাটীর সন্নিধানেই এক গুরুমহাশয় শিক্ষা দিতেন; তিনিই আমাকে লেখাইতেন পড়াইতেন, অল্প দিনেই গুরুমহাশয়ের নিকটে শিক্ষিতব্য বিষয় সমুদায় অভ্যাস করিলাম, তখন আমাদিগের কুলগুরু মুকুন্দ স্বামী আমাকে তাঁহার চতুষ্পাঠীতে লইয়া সংস্কৃত শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। কুক্ষণে মহাকবি কালিদাসকৃত কুমার সম্ভবের একটী কবিতা পাঠ করিলাম,—কামিনী স্মিতমুখে রহিলেন, আর কথা কহি-

লেন না। হেমন্ত ভাবে বুঝিয়া বলিলেন "পরে কি হইল?" বলিবার কোন বাধা নাই। এখানে আর কে আছে? কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বনের পর কামিনী কহিলেন, তখন ইচ্ছা হইল, যদি পার্ব্বতীর মত স্বামী পাই তবেই বিবাহ করিব। যত দিন না পাইব, নিভৃতে কৈলাসনাথের পূজায় জীবন কাটাব। মনের কথা কাহাকেও খুলি নাই, ক্রমে কন্যাকাল অতীত হইতেছে দেখিয়া পিতা শুভ সম্বন্ধের মানসে দেশ বিদেশে লোক পাঠাইতে লাগিলেন। যখন তখন তিনি আমার নিকট আমার বিবাহের কথা বলিতেন, আমি তাহাতে সন্তুষ্ট হইতাম না। মুখভঙ্গীতে মনের ভাব সম্পূর্ণ জানিতে পারা যায়, বিরস বদন দেখিয়া পিতা মনে করিতেন, কন্যা বুঝি কেবল মাত্র কথাতেই সন্তুষ্ট নয়। যত শীঘ্র পারেন শুভ কার্য্য সমাধা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং সহচরীগণকে কৌশলে মনোভাব জানিবার জন্য বলিয়া দিলেন। এক দিন আমার প্রিয়তমা সহচরী মন্ত্রীকন্যা তিলোত্তমা বাগানে ফুল তুলিতে তুলিতে কহিল "এইবার ভাই তুই আমাদের সঙ্গ ছাড়িয়া কার রাজলক্ষ্মী হবি, আর কদিনই বা আমরা হেসে খেলে তোর সঙ্গে বেড়াব।" সখীর বাক্যে মনে সুখ হইল না, বরং বিরক্ত ভাবে বলিলাম "সে ভাই অনেক দিনের কথা,

অদৃষ্টে কি আছে কে বলিতে পারে, মনের মত না হয় ত এখন কতদিন এমন করে ফুল তুলে বেড়াতে হবে" তিলোত্তমা বুদ্ধিমতী ইঙ্গিতে মনোভাব বুঝিয়া লইলেন, কোন সময় বোধ হয় পিতাকেও জানাইয়া থাকিবে, পিতা বিবাহের উদ্দেশ কিছু দিনের জন্য পরিত্যাগ করিয়া রাজবাটীর অনতিদূরে একটী পুষ্করিণী খাত করাইয়া ঘাটের উপরে এক শিবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং তথায় আমার জন্য এক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। কি উদ্দেশে জানি না, আমার নামে সেই পুষ্করিণীর নামকরণ করিলেন সহচরীগণ সহ কিছু দিন আবাসে অবস্থিতি করি। পিতার অতিথি সেবা ছিল সময়ে সময়ে বিশেষতঃ গঙ্গাস্নানের তিথিযোগ আর জগন্নাথদেবের রথ যাত্রাবকালে এবং গঙ্গাসাগর দর্শন সময়ে নানা দিগ্‌দেশ হইতে সাধুমণ্ডলী সমাগত হইতেন। একদা বৈশাখী পূর্ণিমার দুই তিন দিন পূর্ব্বে বেলা প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় পার্ব্বতীনাথের অর্চ্চনার পর কতকগুলি সন্ন্যাসীকে সরোবরে কৃতাহ্নিক অবস্থায় দৃষ্টি করিলাম। তাঁহাদিগের মধ্যে একজন কিয়ৎকাল এক দৃষ্টিতে আমার প্রতি চাহিয়া ছিলেন, এবং আমি আসিলে পরে আমার পুষ্পাধারবাহিকা দাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কে? পরিচারিকা প্রতি উত্তর দিয়া আমার সঙ্গে আসিল। অবিলম্বেই আমি আপন

আবাসে পৌছিলাম ; কিন্তু মনোমধ্যে একটু সন্দেহের উদয় হইল, সন্ন্যাসী কেন এরূপ ভাবে আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু সামান্য কথা, সে জন্য চিন্তা করিতে হয় এমন কিছু কারণ ছিল না। প্রতিদিন যেমন করি, সেই রূপ ধূর্জ্জটীর পূজা করিলাম ; পূজা-কালে বিঘ্ন দেখিয়া মনে সন্দেহ হইল, যত বার দেব-মূর্ত্তির মস্তকে পুষ্প অর্পণ করি পুষ্প থাকে না ; ভূতলে পতিত হয়। এই অলক্ষণের কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। মনটা খারাপ হইয়া গেল। কিছুই ভাল লাগিল না। ক্রমে সন্ধ্যা হইল। একে গ্রীষ্মকালীন সন্ধ্যা, তায় আবার মন চঞ্চল, একাকী সরোবরতীরে বেড়াইতে ছিলাম, সুশীতল সমীরণ স্পর্শে, এবং নিস্তব্ধতায় সহজেই নিদ্রা আসিল, দিক্‌বিদিক জ্ঞান রহিল না।

রাত্রি অধিক, প্রহরীগণ হতচেতন, জগৎ নিদ্রিত, সুতরাং নীরব ; কিন্তু প্রত্যেক কীটাণু হইতে প্রকাণ্ড হস্তীযূথ পর্য্যন্ত জগতের যাবতীয় ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রাণী নিরন্তর যাঁহার দৃষ্টিপথে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে ; অতল জলধিগর্ভ, পর্ব্বতকন্দর নিবিড়দুর্গম অরণ্যানি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র যাঁহার দৃষ্টি অব্যাহত রহিয়াছে ; কি ঘোরতর মেঘাবৃত তমস্বিনী কি সৌরকরবিভাসিত দিবাভাগ সর্ব্বক্ষণ যাঁহার চক্ষু নিমীলিত থাকে, তিনিই এখন কেবল জাগ্রত। কিন্তু এ অভাগিনীর গ্রহবৈগুণ্যে

তিনিও নিদ্রিতের ন্যায় কার্য্য করিলেন, দেখিয়াও দেখিলেন না। আমি স্বপ্ন দেখিলাম যেন এক দুর্গম কান্তারে প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছি; ভয়ে বুক কাঁপিতেছে; অদূরে জনকয়েক দৈত্যাকার বিকট পুরুষ তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া আমার দিকে আসিতেছে। ভুক্তভোগী ভিন্ন সে অবস্থা বর্ণনে সক্ষম হইতে পারে না। প্রাণ ব্যাকুল হইতে লাগিল, এমনি দৈবের কৌশল তদবস্থাতে আর অধিকক্ষণ থাকিলে বোধ হয় মহানিদ্রাগত হইবার সম্ভাবনা, সে জন্য নিদ্রাভঙ্গ হইল, ঘুম ভাঙ্গিলে দেখিলাম রজনী প্রভাত প্রায়, ভোরের স্বপ্ন প্রায়ই সফল হয়, ইতিমধ্যে শয্যা আন্দোলিত হইতেছে এরূপ বোধ হইতে লাগিল, চক্ষু মুছিতে মুছিতে দেখি, যথার্থই শয্যা চলিতেছে, যেন চারিজন পালঙ্কের পায়া ধরিয়া আমাকে শূন্যে তুলিয়া লইয়া যাইতেছে। নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন দর্শনে যাদৃশ ভয় না হইয়া ছিল, জাগ্রতে তদপেক্ষা অধিক হইল, হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিতেও পারি না; তাহারা কে? কি জন্য এরূপে লইয়া যাইতেছে, আর কোথায়ই বা যাইতেছে, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, কি করি বড় ভয় হইল, অদৃষ্টে যা আছে ঘটিবে, এই ভাবিয়া চুপ করিয়া মৃত-প্রায় পড়িয়া রহিলাম। রাত্রি ভোর হইয়াছে, গ্রাম মধ্যে বৃক্ষশাখায় পাখীগণ ডাকিয়া উঠিল। আস্তে

আস্তে শীতল বাতাস প্রবাহিত হইয়া শরীর শীতল করিতে লাগিল। একটী অশ্বত্থ তরুতলে বাহকেরা আমার শয্যা নামাইয়া বসিল; তখন ভোর হইয়াছে, নিকটের লোক দেখিলে বেশ চিনিতে পারা যায়, দেখিয়া জানিলাম, বাহকেরা পূর্ব্বদিনের সন্ন্যাসী, তখন আমি আর নাই, ভয়ে কণ্ঠ শুকাইয়া গেল, কি করি কার কাছে কাঁদি, কি বলিয়া কাঁদি, কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিলাম না, ক্ষণেক পরে দেখি হৈঃ। হৈঃ। শব্দে একদল সন্ন্যাসী আসিয়া পৌঁছিল, সকলেই আমাকে চতুর্দ্দিকে ঘেরিয়া দণ্ডায়মান হইল। অনেকেই আমার সতীত্ব নাশের প্রয়াশ পাইতে লাগিল, তখন মনে হইল, পৃথিবী দ্বিধা হয় ত প্রবেশ করি; পাখীর পাখা পাই ত যদৃচ্ছা উড়িয়া গিয়া সতীত্ব ধন বাঁচাই। জগতে কযজনের ইচ্ছাগত কাজ হয? কয়জনের মনস্কামনা সিদ্ধ হইতে দেখা যায? যে আমার হইবে। সকলের যা হয় আমারও তাহাই হইল; কিন্তু সৌভাগ্য এই যে তাহাদিগের পশ্চাতে এক জন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী আসিতেছিলেন, তিনিই দলপতি। দলস্থ সকলেই তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই আমার নিকট হইতে সরিয়া গেল, কিন্তু দূর হইতে তিনি দুষ্টদিগের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া ছিলেন, তিনি আসিয়া তাহাদিগকে অত্যন্ত ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন, আপনার সম্প্রদায়

হইতে তাহাদিগের পৃথক্ করিয়া দিতে চাহিলেন; কিন্তু "ঠক বাছিতে গাঁ উজাড়" সকলকেই ত্যাগ করিতে হয়; এজন্য তাহাদিগকে অনেক বুঝাইলেন। তাহারাও তাঁহার নিকট অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল, তখন তিনি তাহাদিগকে কহিলেন যে তাহারা আমাকে পিতৃ আবাসে যেন রাখিয়া আইসে; তাহাতে তাহারা অস্বীকার করিয়া কহিল, "আমরা অনেক দূর আসিয়াছি, এখান হইতে সেস্থান দ্বাদশ ক্রোশেরও অধিক" আমাকে জিজ্ঞাসা করায় আমিও দুষ্টদিগের সঙ্গে যাইতে সঙ্কুচিত হইলাম। পাছে তাহারা পথের মধ্যে কোন অনিষ্ট করে। সন্ন্যাসীপ্রধান কহিলেন, "তবে ইহাকে আশ্রমে লয়ে যাও, সেখানে আমার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করা যাইবে এবং যথাকালে পুষ্পচয়ন ও পূজাহ্নিকের আয়োজনাদি করিবে" তাহাই নির্দ্দিষ্ট হইল; কি করি, তাহাতেই স্বীকৃত হইলাম। কিয়দ্দিবস পরে এই স্থানে আসিয়া পৌছিলাম। এই সরোবরের অনতিদূরেই আশ্রম, সেই দিন অবধি ব্যাধগৃহ পালিতা হরিণীর ন্যায় কাল কাটাইতেছি, যদিও আশ্রমাধ্যক্ষ আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন, তথাপি সর্ব্বদা সশঙ্কিত আছি, কি জানি দুষ্টেরা কখন কি করে, আমি তাহাদিগের সাধু ৷থবিগর্হিত প্রস্তাবে সম্মত নহি বলিয়া লঘু অপরাধে গুরুদণ্ড প্রদান করে, দেবাদিদেব কৈলাসনাথের

সুপায় আপনার সাক্ষাৎ পাওয়াতে হাতে যেন চন্দ্র পাইলাম, মৃত দেহে জীবন সঞ্চার হইল, এখন আশা হইতেছে যে কোন দিন না কোন দিন জন্মভূমির দর্শন পাইব; বহু দিন পরে বৃদ্ধ পিতামাতার সাক্ষাৎ লাভে নয়নের সফলতা সম্পাদন করিব, এক্ষণে আপনার আশ্রিত; শরণাগতের উপকার করা মহতের কর্ত্তব্য অতএব অধিনীকে আশ্রয় দানে কুণ্ঠিত হইবেন না। আর এরূপ পরোপকার করায় আপনার সর্ব্বতোভাবে যশঃ ও পুণ্য লাভ হইবে, একথা বলা বাহুল্য। আপনার মুখশ্রীতে বুদ্ধি মত্তায় ও অঙ্গ ভঙ্গিমায় বিপুল বিক্রমের পরিচয় পাইতেছি. অতএব ভবিষ্যতে আপনার যে কোন প্রত্যুপকার হইবে এরূপ লোভ পদর্শনে আপনাকে আশান্বিত করা নিতান্ত হীন বুদ্ধির কার্য্য এজন্য আমি তাহাতে ক্ষান্ত থাকিলাম। বোধ হয় এ কথা বলিবার কোন হানি নাই যে আমার প্রাচীন জনক জননী আপনার নিকট হইতে যদি আমাকে লাভ করেন তবে তাঁহারা আপনার নিকট চির জন্মের মত কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকিবেন, ধন মান প্রাণ আপনাকে তাঁহাদের কিছুই অদেয় থাকিবে না। আমি যে স্বাধীনতার জন্য একান্ত অধীরা হয়েছি, এ কথা বোধ হয় আমার ইতিবৃত্ত বর্ণনের পরেই বুঝিতে পারিয়াছেন। এই বলিয়া যুবতী নীরব হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

হেমন্ত কুমার, অত্যন্ত বলবান, সাহসী, স্থিরপ্রকৃতি, বিপদে অধীর নয, মনুষ্য স্বভাবের অসারতা রূপ চাতুর্য্যের বশীভূত নহে সুতরাং বৃথা আস্ফালন না করিয়া বলিলেন "শরণাগতের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিলাম; প্রাণ থাকিতে আপনার পদাঙ্গুষ্ঠে আঘাত লাগিতে দিব না। কিন্তু আমি যখন যেরূপ যুক্তি দিব তখন সেই রূপ করিতে হইবে। ইহার অন্যথা হইলে, আমা দ্বারা আপনার পরিত্রাণ প্রত্যাশা বৃথা। যুবতী নম্র মুখে উত্তর করিলেন "দাসীও সাধ্যানুসারে আপনার আদেশ পালনে ত্রুটী করিবে না।"

হেমন্ত। আপনি অদ্য আমার সমভিব্যাহারিণী হইতে পারেন কি না?

যুবতী। ইচ্ছা বটে, ঘটে কই।

হেমন্ত। ঘটিবার কোন বাধাই নাই, তবে আপনার ইচ্ছা।

যুবতী। আমি অনিচ্ছুক নই, কিন্তু পাছে আপনার কোন বিপদ ঘটে।

হেমন্ত। স্ত্রীলোকে ভয় করে এমন কোন বিপদ্ আমাকে বাধা দিতে পারিবে না।

যুবতী। দাসীর জন্য যদি আপনার কোন অমঙ্গল ঘটে তবে সে বিষম পরিতাপের বিষয়।

হেমন্ত। কি জন্যই আপনি বারম্বার এরূপ বাধা প্রদান করিতেছেন।

যুবতী। আমি দীর্ঘকাল আশ্রম ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি; যদি কেহ অনুসন্ধান করে, এবং এখনি এ স্থানে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আমাদের উভয়েরই বিপদ যে হেতু তাহাদের সংখ্যা অধিক, আপনি একাকী কি করিবেন? আমার ইচ্ছা বাসন্তীপূর্ণিমা অতি নিকট, ঐ দিবস আশ্রমের সকলেই বক্রেশ্বর তীর্থ দর্শনে যাইবে, আশ্রমে দুই এক জন রক্ষক মাত্র থাকিবে; অতএব আপনি যদি সেই দিন চেষ্টা করেন, তাহা হইলে, সহজেই দাসীর উদ্ধার সাধন করিতে পারিবেন।

হেমন্ত। আচ্ছা! যাহাতে আপনার সুবিধা হয় তাহাতেই স্বীকৃত আছি। বাসন্তী পূর্ণিমা আর কয় দিন আছে?

যুবতী। দেখুন না আজ দ্বাদশী, মধ্যে ত্রয়োদশী

চতুর্দ্দশী দুটী দিন। দাসীকে ভুলিবেন না। আপনি মনোযোগী না হইলে চিরকাল এ যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইতে পারিব না। ঈশ্বর আছেন আর আপনি রহিলেন।

হেম। আপনার জন্য আমাকে অনুরোধ করিতে হইবে না। ভীষণ মকর, হাঙ্গরের ভয় পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্য অতল সমুদ্রে নিমগ্ন হন, প্রাণের ভয় রাখে না। এত দুঃসাহসিকতা কেন? রত্ন লাভের জন্য? রত্নকে অনুসন্ধান করিতে হয়, রত্ন কাহাকেও অনুসন্ধান করে না।

যুবতী। রত্নবণিকের নিকট বহু অমূল্য রত্ন আপনা হইতে যায়। সে রত্নবণিকের গুণ, রত্নের গুণে নহে।

হেম। বিনয়ের লক্ষণই বটে। যতদূর বাড়াইতেছেন ততদূর নয়। যাই হউক, আমার প্রতিজ্ঞা রহিল, আমি পূর্ণিমা তিথিতে এই বীজন বন হইতে আপনাকে উদ্ধার করিব।

যুবতী। মহতের বাক্য হস্তীদন্তের ন্যায়;—বহির্গত হইলে আর পুনঃ প্রবিষ্ট হয় না। যে দিন কার্য্যে তাহা দেখিব, মহাজনের বাক্য সার্থক বলিয়া মানিব।

হেম। তবে আজ বিদায় হই? বেলা শেষ হইয়াছে। ধরিত্রী দিনমণির সম্মুখ হইতে আমাদিগকে সরাইয়া লইতেছেন, প্রকৃতি জীবগণকে রজনী অতি

বাহনের জন্য আশ্রয় অন্বেষণে ইঙ্গিত করিতেছে। আজি আসি।

যুবতী। কেমনে অনুমোদন করি? সৎসঙ্গ পরিত্যাগে কে ইচ্ছুক হয়? বিশেষ এ নিবিড় বন আপনি অপরিচিত, কিরূপে একাকী এই শ্বাপদসঙ্কুল স্থলে রাত্রি যাপন করিবেন?

হেম। আজি দুই সপ্তাহের অধিক কাল এই বনে যাতায়াত করিয়া অনেক স্থান আমার পরিজ্ঞাত হইয়াছে। সে জন্য আপনার কোন চিন্তা নাই।

যুবতী। তবে দাসীর প্রার্থনা এই, যে কোনমতে উত্তর দিকে যাইবেন না, বনের কিছু দক্ষিণ ভাগে যে সাঁওতালদিগের ক্ষুদ্র পল্লী দেখিতে পাইবেন, সেখানে সুখে রাত্রি যাপন করিতে পারিবেন, এমন কি আহারাদিরও অভাব হইবে না। উহারা বড় আতিথেয়।

হেম। সন্ধ্যা হইল, তবে আসি।

এই বলিয়া হেমন্ত বিদায় হইলেন, যতক্ষণ দৃষ্টি চলে যুবতী ততক্ষণ স্থির নয়নে চাহিয়া থাকিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন, বৃক্ষপত্রের পতন শব্দে হেমন্তের প্রত্যাগমন আশা করিয়া এক একবার ফিরিয়া দেখিতে দেখিতে চলিয়া গেলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মৃতপ্রায় আহত যুবকের সহিত সাক্ষাৎ।

যুবতীর নিকট বিদায় লইয়া হেমন্তকুমার সে রাত্রি এক সাঁওতাল কুটিরে অতিবাহিত করিয়া পুনরায় বৈদ্য নাথতীর্থে দুই দিবস অতিবাহিত করিবার বাসনায় সেই দিকে যাত্রা করিলেন। ক্রমে বেলা অধিক হইল, সূর্য্যরশ্মি অতিশয় গরম হইয়া উঠিল, পথের মাটী উত্তপ্ত হইয়া অগ্নিবৎ বোধ হইতে লাগিল, পান্থজনের গমন দুঃসাধ্য হইল। হেমন্ত ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ব্যাকুল হইয়া মৃদু-পদে কোন জলাশয়ের অন্বেষণ করিতেছেন, এমন সময় মনুষ্যকণ্ঠের কাতরধ্বনি শ্রবণ করিলেন। শ্রবণমাত্র চকিত, বিস্মিত এবং সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন, ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে গেল। হেমন্তকুমার সেই শব্দ উদ্দেশ করিয়া দ্রুতপদে সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন। যাহা দেখিলেন, তাহা অতি ভয়ঙ্কর। দেখিলেন, একটি যুবক ধরাশয্যায় শায়িত, তাহার অঙ্গ অস্ত্রা-

গাত্রে ক্ষত বিক্ষত, এবং জ্ঞান হইয়া কেবল আর্ত্তনাদ করিতেছে, আহত ব্যক্তির পার্শ্বে একখানি তীক্ষ্ণধার তরবারি পড়িয়া আছে, হেমন্ত এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার অবলোকন করিয়া জানিতে পারিলেন যে কোন নির্দ্দয় ব্যক্তি এই ব্যক্তির প্রাণ বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, বোধ হয় মৃতজ্ঞানে বিনাশ ইচ্ছুককারী পলায়ন করিয়াছে। হেমন্তকুমার আহত ব্যক্তির নিকটে গিয়া কি উপায়ে তাহার জীবন রক্ষা করিতে পারা যায় তাহার চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি বিবেচনা করিলেন যে এ স্থান হইতে ইহাকে স্থানান্তরিত করিলে তৎক্ষণাৎ ইহার জীবন শেষ হইবে। অতএব তাহা না করিয়া যে কোন উপায়ে ইহার প্রাণরক্ষার উপায় করিতে হইবে, এখন কি করি, কি উপায়ে ইহার প্রাণ রক্ষা হয়, এই চিন্তা করিতে করিতে দ্রুতপদে জল আনয়ন উদ্দেশে গমন করিলেন এবং নিকটস্থ এক নির্ঝর হইতে স্বীয় বস্ত্র সিক্ত করিয়া আহত ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার মুখে জল দিতে আরম্ভ করিলেন, জল পানে আহত ব্যক্তি চক্ষু উন্মিলীত করিল বোধ হইল যেন সে একটু সুস্থ হইয়াছে। হেমন্তকুমারের আহারাদি দূরে গেল, তিনি যত্ন সহকারে আহতের সুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। বস্ত্র ছিন্ন করিয়া তাহার ক্ষত স্থানে পটি বাঁধিয়া দিলেন এবং কিরূপে

তাহাকে গহন বনমধ্য হইতে লইয়া যাইবেন, তাহার চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে দূরে বহু মনুষ্যের গোলমাল এবং অশ্বের পদশব্দ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল, হেমন্তকুমার ভাবিল, বোধ হয় কোন ব্যক্তি শিকারজন্য এই কাননে প্রবেশ করিয়াছে যাহা হউক. দেখি যদি ইহাদের সাহায্যে আহত ব্যক্তিকে কোন লোকালয়ে লইয়া যাইতে পারি। ক্ষণেক পরেই কয়েক জন অশ্বারোহী সেই স্থানে উপস্থিত হইল। আহত ব্যক্তিকে দেখিয়া তাহারা অশ্ব হইতে নামিয়া আহতের নিকট দণ্ডায়মান হইল এবং বলিতে লাগিল কোন্ নরাধম এরূপ করিয়াছে, সে জানে না যে ভীষণ ব্যাঘ্রের গাত্রে অস্ত্রাঘাত করিয়াছে, তখন হেমন্তকুমার তাহাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে উহারা আহত ব্যক্তির সমভিব্যাহারি সৈনিক, আহত ব্যক্তির মৃগোদ্দেশে তাহাদিগকে পশ্চাতে রাখিয়া এই বিজন কাননে প্রবেশ করিয়াছিলেন, বোধ হয় বিশ্রাম লাভার্থে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া এই বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলে তাহাকে অস্ত্রাঘাতে মৃতপ্রায় করিয়া চলিয়া গিয়াছে। সৈনিকগণ হেমন্তকুমারের কার্য্য দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইল ও ধন্যবাদ দিতে লাগিল। তখন তাহারা বলিল এস্থান হইতে কোন প্রকারে লইয়া না গেলে

প্রভুর প্রাণরক্ষা করা দায় হইবে, অতএব যে কোন প্রকারে লইয়া যাইতে হইবে। ইহাদের মধ্যে একজন অশ্বারোহণ করিয়া শিবিকা আনয়ন জন্য গমন করিল। তখন হেমন্তকুমার আহত ব্যক্তির পরিচয় সৈনিকগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন এবং জ্ঞাত হইলেন প্রতাপচন্দ্র সাঁওতাল বিদ্রোহ দমন জন্য এখানে আসিয়াছিলেন। ক্ষণেক পরে শিবিকা আসিয়া পৌঁছিল, সৈনিকগণ আহত ব্যক্তিকে লইয়া গমন করিল। তাহারা হেমন্তকে লইয়া যাইবার জন্য অনেক আগ্রহ প্রকাশ করিল কিন্তু হেমন্ত কিছুতেই রাজি হইল না। পরে হেমন্ত সেস্থান হইতে প্রস্থানের উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময় একটী ছিন্ন গাত্রাবরণ তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল নিকটে গিয়া গাত্রাবরণটি তুলিয়া দেখেন যে ছিন্ন গাত্রাবরণটি আহত ব্যক্তির, বোধ হয় উভয়ের দ্বন্দ্ব যুদ্ধে সেটী ছিন্ন হইয়াছিল। হেমন্ত তাহার বসন, নাড়িতে চাড়িতে তন্মধ্যে একখানি পত্রিকা দেখিতে পাইলেন। পত্রিকা খানি শোণিতে আর্দ্র, এজন্য অতি সাবধানে খুলিয়া পাঠ করিলেন।

হৃদয়বল্লভ।

আপনার সহিত কয়েক দিবস দর্শনেই আমি আপনার একান্ত পক্ষপাতিনী হইয়াছি। কিন্তু গমন কালে আমার সহিত সাক্ষাৎ না হওয়াতে আমি

জীবিতে মৃতের ন্যায় ছিলাম, কিন্তু সহসা এক দিন, আপনার ভৃত্যকে দেখিতে পাইয়া আপনার কথা জিজ্ঞাসা করায় জানিলাম, আপনি রাজকার্য্যানুরোধে দূরদেশে গিয়া পড়িয়াছেন। যদি দাসীর প্রতি আপনার একান্ত স্নেহ থাকে তবে পত্রিকা প্রাপ্ত মাত্র আসিয়া অধিনীকে আশ্রয় দান করুন, পিতৃদেব পরিণয় উদ্দেশে নানা স্থানে পাত্রান্বেষণ করিতেছেন। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা যে তিনি দুরাত্মা কৃষ্ণচন্দ্রের হস্তে আমাকে সমর্পণ করিয়া চিরকালের নিমিত্ত অকুল পাথারে ভাসাইয়া দেন। আপনার আশায় এ প্রাণ রাখিয়াছি, জানি না অদৃষ্টে কি আছে। হয়ত প্রিয় সখী প্রভাবতীর মত কোন্ দিন কোন্ দুরাচারের হস্তে ইহ জীবনের সমস্ত আশা ভরসা ফুরাইয়া যাইবে। সত্বর আসিয়া দাসীকে রক্ষা করুন। ইতি।

আপনার তিলোত্তমা।

পত্র পাঠে হেমন্ত কুমারের মনে সমধিক দুঃখ হইল, একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িলেন, কি করেন এ বিধানের কোন উপায় নাই, একজন সরলমনা কামিনীর প্রণয়াঙ্কুর ছিন্ন হইবার উপক্রম হইয়াছিল, কি সর্ব্বনাশ! শিরোনামটী পড়িয়া মৃত ব্যক্তির নাম অবগত হইতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু শিরোনামের উপরিভাগে এতাধিক শোণিত জমিয়া ছিল যে খুলিতে খুলিতে

উপবিভাগটী সম্পূর্ণ ছিন্ন হইয়া গেল; পাঠ করিবার কোন উপায় হইল না। তখন অতি যত্নসহকারে পত্র মধ্যভাগ আপন নিকটে রক্ষা করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি উপায়ে উপস্থিত ব্যাপারের গুহ্যকথা অনুসন্ধান পাইতে পারেন। ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, যদি সমভিব্যাহারী কেহ কোন গুপ্তস্থানে লুক্কাইত থাকে; অনেক ক্ষণ চেষ্টা করিলেন কিছুতেই কিছু হইল না। ক্রমে বেলা শেষ হইল, দিনকর হীন জ্যোতিঃ হইয়া পশ্চিমাকাশে গমন করিতেছেন হেমন্ত কুমারের তখনও স্নানাহার হয় নাই; নিকটে এক সরোবর দেখিতে পাইয়া তিনি তাহার নিকটবর্ত্তী হইলেন। সরোবরের শোভা অপূর্ব্ব, দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ জল, ঘনবিন্যস্ত বিকশিত নলিনীদলে সমাচ্ছন্ন মন্দ মন্দ মারুৎ হিল্লোলে ঈষৎ অবনত মৃণাল পার্শ্ব দিয়া সরোবরনীরে সৌরকর প্রবিষ্ট হইয়া যেন লুকোচুরি খেলাইতেছে। হেমন্ত কুমার সরোবরের অপর পারে সন্ন্যাসীদিগের আশ্রম দেখিতে পাইলেন, ঐ আশ্রমে সন্ন্যাসী সম্প্রদায় ভিন্ন দুইটী অপর লোক ছিল, তাহাদের আকার প্রকার ও পরিচ্ছদের ভাব ভঙ্গি দেখিয়া তাহাদিগকে জনপদবাসী বলিয়া বোধ করিলেন। এই মাত্র আহত ব্যক্তির দর্শন করিয়া আসিলেন, তাহার অব্যবহিত পরেই সন্ন্যাসীর আশ্রমে অপর দুই

জন লোক দেখিয়া তাঁহার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল তিনি বিবেচনা করিয়া স্থির করিলেন, শত্রু হউক বা মিত্রই হউক আহত যুবকের সহিত উহাদিগের কোন সংশ্রব আছে। এই চিন্তায় অনেক সময় গিয়াছে, স্নানাহার হয় নাই, আহারাদি না করিয়া উহার তথ্য জানিতে আর বড় কৌতূহল জন্মিল না। হেমন্তকুমার স্নান করিয়া সুস্নিগ্ধ হইলেন কিন্তু উদ্বেগ ঘুচিল না, সর্ব্বদাই চিন্তা হইতে লাগিল যে উহারা কে? সে চিন্তা বড় অধিক ক্ষণ স্থায়ী হইল না। স্নান করিয়া উঠিবা মাত্র সন্ন্যাসীদিগের আশ্রম হইতে এক জন আসিয়া হেমন্তকে সেই আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণের প্রার্থনা জানাইলেন। হেমন্তকুমার সাহসী, বুদ্ধিমান, যৌবনেই প্রাচীনের বিচক্ষণতা লাভ করিয়াছিলেন, ইচ্ছার অনুরূপ কার্য্য উপস্থিত দেখিয়া প্রার্থনায় অস্বীকার করিলেন না, আপন সন্ধ্যা বন্দনাদি সমাপন করিয়া আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। পৌছিবা মাত্র সকলে সসম্ভ্রমে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন, হেমন্তকুমারও প্রতিসম্ভাষণ করিয়া সন্ন্যাসীদিগের অভ্যর্থনা গ্রহণ করিলেন। সন্ন্যাসী এবং আগন্তুক ব্যক্তিদ্বয়ের সদালাপ ও শিষ্টাচারে বশীভূত হইয়া তিনি তথায় রাত্রি যাপন করিতে স্বীকৃত হইলেন। পরিচয়ে জানিলেন একজন জাতিতে ব্রাহ্মণ নাম কৃষ্ণচন্দ্র অপরের

নাম রঘুনাথ দাস জাতিতে কৈবর্ত্ত উভয়েরই বাস বর্দ্ধমান জেলা। কৃষ্ণ অতিশয় বাচাল এ দেশ সে দেশ নানা দেশের খবর বলিতে পারে; কত রাজা, কত সম্রাটের অন্দরের কথা মুখাগ্র, এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কৃষ্ণকে খোলসা লোক বলিয়া হেমন্তকুমারের সহজেই উপলব্ধি হইল, কিন্তু কৃষ্ণ যে মিছরীর ছুরী, সে কথা হেমন্ত কিরূপে জানিবেন, মনে মনে কৃষ্ণের যে দুরভিসন্ধি আছে, যে রূপেই হউক তাহা সিদ্ধ করিতে হইবে, রাত্রিতে নানা প্রকার কথা বার্ত্তায় আপনার অমায়িকতার পরিচয় দিয়া হেমন্তের সহিত বন্ধুতা সূত্রে বদ্ধ হইবার চেষ্টা করিলেন। হেমন্ত কে? কি জন্যেই বা এ বিজন বনে ভ্রমণ করিতেছে, অবশ্য কোন স্বার্থ-সিদ্ধির সম্ভাবনা থাকিবে, সে স্বার্থ কি? তাহার সহিত কৃষ্ণচন্দ্রের যদি কোন সংশ্রব থাকে, যাহা হউক যতক্ষণ হেমন্তের মনের কথা খুলিয়া না পাইলেন, সে পর্য্যন্ত কৃষ্ণ নানা ভাব ভঙ্গীতে আত্মীয়তা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সেই রাত্রটী বই আর কি বলিয়াই বা হেমন্তকে দুদিন থাকিতে অনুরোধ করেন। হেমন্তকুমার যতই শুদ্ধমনা হউন না, জগতে কে এমন আছে যে এক রাত্রমাত্র এক ব্যক্তির সহিত আলাপ করিয়া তাহার মনের কথা খুলিয়া বলে। সুনিদ্রায় রাত্রি প্রভাত হইল। হেমন্তকুমারের প্রাতঃকৃত্য সমাপন

করিয়া কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট বিদায় লইয়া তথা হইতে— প্রস্থান করিলেন।

দুষ্টেব বুদ্ধি সহস্র প্রকার! আদি অন্ত পাওয়া ভাব, কৃষ্ণ, হেমন্ত কি কবে কোথায় যায়, তাহাব অনুসন্ধানে রঘুনাথকে নিযুক্ত করিল।



অষ্টম পরিচ্ছেদ।

কুসুমকুমারী কি করিল।

অন্য কথায় পাঠকগণকে অনেকক্ষণ ভুলাইয়া রাখিতেছি; হেমন্তকুমার ছাড়িয়া আসিলে কুসুম কি করিল, বলা হয় না। সে বালিকা কাল হইতে হেমন্তে অনুরক্ত; এক দণ্ড, এক মুহূর্ত্ত হেমন্ত ছাড়া থাকিতে পারিত না। পা চলিলেই যেমন দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সর্ব্ব শরীর সেই সঙ্গে চলে, সে হেতু অঙ্গ সমুদায় দেহের সহিত গ্রন্থিপেশী শিরা দ্বারা সংযোজিত, সে সংযোগের বিয়োগ না ঘটিলে বিকৃত হয় না, কুসুমও হেমন্ত দেহে প্রণয় গ্রন্থি, স্নেহপেশী, এবং একাগ্রতা শিরা দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সংযুক্ত। কামিনীদেহে হেমন্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যখন পৃথক হইল দেহের ও সেই সঙ্গে বিকৃতি হইল, পূর্ব্বমত দেহে ও মনে স্ফূর্ত্তি রহিল না, অঙ্গ সমুদয় বিকল হইল, পূর্ব্বের মত চলিতে লাগিল না, সুতরাং যুবতী উন্মাদিনী, কখন হাসে, কখন কাঁদে, কি বলে কিছুরই ঠিকানা নাই, কুসুমের

বাপ মা ছিল না, হেমন্তের পিতামাতাই তাহার এক-মাত্র অবিভাবক ছিলেন, হেমন্তের মাতার কন্যা ছিল না, এজন্য তাহাকে কন্যার ন্যায় স্নেহ করিতেন, তিনি অনেক চিকিৎসা, অনেক যত্ন করিলেন, সাধের ধনকে বজায় রাখিতে চেষ্টার ত্রুটী করিলেন না;—সেই নূতন, সবেমাত্র বিরহ আগুন নূতন জ্বলিয়া উঠিতেছে, উদ্বেগ বায়ু প্রবল বহিতেছে, সে আগুণ নিভায় কে? কিছুতেই কিছু হইল না, চিকিৎসা হারি মানিল; স্বর্ণলতা বন্যার বেগে ছিন্ন হইয়া ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল, তিনি হতাশ হইয়া তাহার আশা ত্যাগ করিলেন, কুসুম সেথা সেথা বেড়াইতে লাগিল; দেহে বেশ বিন্যাস নাই, সুন্দর চাঁচর কেশ বহুদিন করস্পৃষ্ট না হওয়ায় যে যাহার উপর ছিল সে তাহারি সহিত বন্ধুতা করিল, এইরূপে মস্তকে জটাজাল লম্বিত হইল। বিচ্ছেদ নিদাঘ সঞ্চিত বাষ্প রাশি নিবিড় হইয়া নয়ন কমল ও মুখচন্দ্র আবৃত করিল; দর্শকের সুশীতল সমবেদনার বাতাস লাগিতে থাকায়, প্রাবৃট ধারায় দেহ লাবণ্য সমল হইয়া উঠিল। পূর্ব্বের মত কুসুমের আর শ্রীছাঁদ রহিল না। কুসুম প্রণয়ের দায়ে বুদ্ধিশুদ্ধি হারাইয়া সংসারের মায়াপাশ ছিন্ন করিল, এবং নানা দেশ নদ নদী পার হইয়া, পথে, ঘাটে, বৃক্ষতলে, কখন বা গৃহস্থের আশ্রমে রাত্রি যাপন করিয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায়,

ইতিমধ্যে বৈদ্যনাথতীর্থে পাঠকবর্গ ও তাহার ভালবাসার ধন হেমন্তের সহিত সাক্ষাৎ করে, দুর্ভাগ্যক্রমে হেমন্ত চিনিয়াও চিনিতে পারেন না। পাঠক! যদি কেহ কেহ অনুমানে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, সে চিনায় ফল কি? তোমার আমার মত সহস্র লোক তাহাকে চিনুক না কেন, তাহার হৃদয়ের ছবি, যাহার জন্য সে সমস্ত জগতের আশা ভরসা শেষ করিয়া দুর্লভ জ্ঞানরত্ন পর্য্যন্ত হারাইয়া দেশে দেশে গ্রীষ্মের রৌদ্রে শুকাইয়া, শীত-কালের শিশিরে ও বর্ষার বৃষ্টিতে ভিজিয়া বেড়াইতেছে সে যদি না চিনিল, তবে তাহার যাবজ্জীবন সাধারণের অচেনা থাকাই ভাল। তাই কুসুম যেমন তেমন করে ক্ষেপিয়া বেড়াইতে লাগিল, মনে কোন সাধ নাই, প্রাতি হিংসা নাই, যখন যা পায় খায়, কাপড় পায় ত পরে, না পায় উলঙ্গ থাকিতে লজ্জা বোধ নাই, সামান্যে সন্তুষ্ট ;—বাক্‌শক্তি আছে বটে, বড় অধিক কথা কয় না, ঈশ্বরের জীব, ভাবভঙ্গি দেখিলে পাষাণ হৃদয়েরও দয়ার উদ্রেক হয়, প্রচুর ক্ষতি করিলেও তাহার প্রতি ক্রোধ জন্মে না, মুখমণ্ডলে যেন ভালমানুষি মাখান, এ জন্য কি ছেলে, কি যুবা, কি বৃদ্ধ কেহ কখন আমাদের পাগলিনীর গায়ে তামাসা করিয়াও একটী ঢেলা মারে না। কুসুমের পরিণাম যাহা হইল কিয়ৎক্ষণ ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেই জ্ঞাত হইবেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

প্রভাবতীর উদ্ধার।

রাগিণী বাগেশ্রী তাল আড়া।

কামিনী সুন্দরী আহা শশী সহ কি সেজেছে।
পতি সমাগমে যেন সুখ সরোজে ভাসিছে॥
মলয় সৌরভ ভার, বহিতেছে উপহার,
হেরিব সুখ সমাহার, বিহগে কল গাহিছে।
শান্তি সর্ব্বস্থানময়, মনে সুখ উপজয়,
সরোবর মৃদু বায়, সুখ তরঙ্গে নাচিছে॥

আজি বাসন্তী পূর্ণিমা। বৎসরান্তে প্রকৃতির নূতন শ্রী দর্শন করিয়া আকাশে সুধাংশু খানি মুখভরা হাসি হাসিতেছে, আর সেই হাসিতে জগৎ প্রফুল্ল হইতেছে। মলয় মারুত সুমন্দ হিল্লোলে গুন্ গুন্ করিয়া বৃক্ষের পত্র কাঁপাইতেছে ও পথিকের শ্রম দূর করিতেছে। তাহাতেই দেহের স্ফূর্ত্তি পাইয়া কোকিল মধুর স্বরে পঞ্চম গাহিতেছে। যদিও রাত্রি দুই চারি দণ্ড, তথাপি

সুহকার মুকুলে ভ্রমর গুঞ্জনের নিবৃত্তি নাই। এ শান্তি-দায়িনী ক্ষণদায় বসন্তানীল সেবিত বিহঙ্গমকুল আপন আপন অবলম্বিত বৃক্ষশাখায় সহর্ষ ধ্বনি করিতেছে। বনপাদপ সমূহের শাখাভ্যন্তর-প্রবিষ্ট জ্যোৎস্নালোক-দীপ্তপথে হেমন্তকুমার একাকী নির্দ্দিষ্ট সরোবর উদ্দেশে গমন করিতেছিলেন। এমন সময় নিকটে একটী মনুষ্যাকার দেখিতে পাইলেন, তাঁহার সন্দেহ জন্মিল; যেন সেই মনুষ্য তাঁহার গমন পথে চৌকী দিতেছে। পূর্ব্বাবধিই বলিতেছি, হেমন্তকুমার বিপুল বিক্রমশালী, সাহসী, সুতরাং যৌবনসুলভ ঔদ্ধত্য বশতঃ তিনি প্রাণের আশঙ্কা না করিয়া সেই অপরিচিত মনুষ্যের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া দ্রুতপদে তাহার অনুসরণ করিলেন। ক্রমে সে ব্যক্তি দৌড়িতে আরম্ভ করিল, তিনিও তখন অধিকতর কৌতুহলাবিষ্ট হইয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতে লাগিলেন, কিন্তু দূর গিয়া আর সে মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন না, কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। রাত্রি কাল; নির্জ্জন বনে প্রভাবতীর মত যুবতীর উদ্ধার জন্য উৎসুক হইয়া এত বিভীষিকা উপস্থিত হইতেছে কেন, এই সন্দেহ উদয় হওয়াতে তিনি কিয়ৎক্ষণ তথায় স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যখন এক সহায়হীনা রাজকুলাঙ্গনার দাসীত্ব মোচন করিবার

জন্য আশ্বাস দিয়াছেন, তখন তাঁহার প্রাণ যায় তাহাও স্বীকার, তথু দেখিবেন,—ছাড়িবেন না, যতক্ষণ দেহে জীবিনী শক্তি থাকিবে, ততক্ষণ প্রভাবতীর আশা ছাড়িবেন না, এই স্থির করিয়া গহন বিপিন পরিত্যাগ করিয়া তিনি নির্দ্দিষ্ট পথে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, আসিতে আসিতে কিছুক্ষণ পরেই সমীরণ সহ সরসীর তটাহত বিলাসোর্ম্মিধ্বনি শুনিতে পাইলেন। তীরস্থিত বৃক্ষশ্রেণী ও পথ ঘাটের ভাবভঙ্গি দেখিয়া চিনিতে পারিলেন. এই তাঁহার সেই সরোবর, এই স্থানেই তাঁহার সহিত প্রভাবতীর সাক্ষাৎ হইবে। বন মধ্যস্থিত সরোবর, এখানে মনুষ্যের গতি বিধি অতি অল্প; এজন্য ইহাতে রীতিমত গ্রথিত সোপান শ্রেণী নাই, কেবল আশ্রমবাসী সন্ন্যাসীগণ স্থানে স্থানে প্রস্তর খণ্ড ফেলিয়া আপনাদিগের সুবিধা সম্পন্ন করিয়াছেন। তাহার মধ্যে এক প্রস্তর খণ্ডে উপবিষ্ট হইয়া এক যুবতী জানু অগ্রে কপোল বিন্যাসে চিন্তা করিতেছে; মধ্যে মধ্যে মারুত হিল্লোল চালিত বৃক্ষ পত্রের শর২ শব্দে মনুষ্যের পদধ্বনি অনুমান করিয়া এক একবার তীরভূমিতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে,—ইতিমধ্যে হেমন্তকুমার সরোবর ঘাটে যুবতী সকাশে উপস্থিত হইলেন, যুবতী সাগ্রহে দৃষ্টি ফিরাইবামাত্র হেমন্তকে দেখিতে পাইয়া বলিয়া উঠিলেন "আপনি আসিয়াছেন?"

হেমন্ত। এ রাত্রিকালে জনশূন্য অরণ্য মধ্যে কুল-কামিনীর সহায়তা করা বড় সহজ ব্যাপার নহে।

যুবতী। তবে বুঝি আরও কত দিন দাসীর অদৃষ্টে বনবাস ক্লেশ আছে?

হেমন্ত। তা বলিতেছি না, এই হিংস্র জন্তু পূর্ণ বনে দিবাভাগেই যাতায়াত করিতে ভয় হয়, তায় এ ঘোর রজনী।

যুবতী। তবে কি আজি রাত্রি এস্থানে যাপন করিবেন? কিন্তু দাসীর ইচ্ছা, যদি একদণ্ড স্বাধীন হইয়াও সিংহব্যাঘ্র মুখে প্রাণ হারাইতে হয় সেও ভাল।

হেমন্ত। যখন স্বাধীনতার জন্য স্ত্রীলোকের এতাদৃশ আগ্রহ, তবে পুরুষস্বভাব কোন মতে তাহাতে প্রতিবন্ধক হইবার নহে। তবে আর বিলম্ব না করিয়া, আশ্রমপথে অগ্রসর হউন।

যুবতী। আশ্রম পথে যাইবার ফল কি? একবারে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করাই উচিত।

হেমন্ত। আমার একান্ত ইচ্ছা একবার দুরাত্মাদিগের উপযুক্ত দণ্ড বিধান করিয়া, তবে আপনার উদ্ধার সাধন করি।

যুবতী। তাহার আবশ্যক নাই, মনুষ্যমনে প্রতিহিংসাকে স্থান দেওয়া উচিত নহে। তাহাতে অনেক বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে।

হেমন্ত। আপনার ইচ্ছামত কার্য্যই হউক, তবে আসুন!

অগ্রে হেমন্ত পশ্চাৎ যুবতী গমন করিল. সরোবর-তীর অতিক্রম করিয়া কিছু দুর যাইতে না যাইতেই অদূরে দুইটি মনুষ্যমূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হইল, তাহারা উর্দ্ধ-শ্বাসে নব-মিলিত যুবক যুবতীর দিকে দৌড়িয়া আসিতেছে। তাহাদিগের আকার অতি ভয়ানক, শিরে জটা, বক্ষঃস্থলে লম্বিত শ্মশ্রু, ললাটদেশে সিন্দুরচন্দনে চিত্রিত ত্রিপুণ্ড্রক, সুদীর্ঘ বাহু; বিস্তৃত বক্ষস্থল কেবল-মাত্র কটি ও জঘন দেশ আবৃত গেরুয়া বসন, দেখিতে দেখিতে নিকটবর্ত্তী হইল, হেমন্তকুমার সদর্পে যুবতীকে কহিলেন, "কিছুমাত্র ভয় নাই, যতক্ষণ প্রাণ থাকিবে ততক্ষণ দুরাত্মারা আপনার গাত্র স্পর্শ করিতে পাইবে না, আপনি এই অপ্রশস্ত অরণ্যপথে অগ্রসর হইয়া আমার প্রতীক্ষা করিবেন, আমি দুরাচার দিগের উপ-যুক্ত শাস্তি বিধান করিয়া যাইতেছি।" এই বলিয়া তিনি স্বীয় যজ্ঞোপবীত কটিদেশে বন্ধন করিলেন, এবং নিকটবর্ত্তী একটী বৃক্ষশাখা ভঙ্গ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন; আগন্তুক ব্যক্তিদ্বয় সেই কণ্টকময় বৃক্ষসমা-কুল সঙ্কীর্ণ পথে অতিদ্রুত আসিতে স্খলিতপদ হইবা-মাত্র হেমন্তকুমার সজোরে তাহাদিগের উপর আঘাত করিলেন, সেই আঘাতেই তাহারা চলৎশক্তি হীন হইয়া

পড়িল। হেমন্ত তাহাদের চেহারায় জানিলেন, যে ইঁহারা আশ্রমভৃত্য, প্রভাবতীর রক্ষক, বিনয় সহকারে আপনাদিগের জীবন যাচ্ঞা করিতে লাগিল, হেমন্ত তাহাদিগের দুরবস্থার এক শেষ করিয়া উভয়কে লতাপাশে জড়াইয়া বৃক্ষমূলে আবদ্ধ করিতেছেন, এমন সময় প্রভাবতীর আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলেন। যাহার জন্য এত কষ্ট, ত্বরিত গমনে তাহার নিকটস্থ হইলেন, এবং দেখিলেন ভয়ানক দৃশ্য। যুবতীর হস্তে ছুরিকা; সর্ব্বাঙ্গ রুধির চর্চ্চিত, এখন আর সে প্রভাবতী নহে— যেমন ভৈরবী, তখন তাহার মুখে কথা ছিল না, অকস্মাৎ দেখিয়া বোধ হইল যেন কাষ্ঠ পুত্তলী।

কিছুক্ষণ পরে তাঁহার উন্নত হস্ত অবনত হইল। হেমন্ত নিকটে গিয়া কহিলেন, এ কি?

যুবতী। জানি না কোন দুর্বৃত্ত আমার অঙ্গস্পর্শে উদ্যত হইতে ছিল, একবার নিষেধ করিলাম, দুইবার নিষেধ করিলাম শুনিল না, অল্পায়ুঃ পতঙ্গের ন্যায় দীপশিখার নিকটস্থ হইতে লাগিল, নিকটে আসিবামাত্র এই ছুরিকাঘাতে যমালয়ে পাঠাইয়াছি, পাপিষ্ঠের সঙ্গে একজন ছিল, সে দেখিয়া পলায়ন করিয়াছে।

হেমন্ত। উহারা কার কি সর্ব্বনাশ করিয়া এদেশে লুক্কায়িত ছিল তাহার সন্দেহ নাই, এ একজন ভয়ানক ডাকাইত, এর নাম যে রঘুনাথ,—আপনাদের বর্দ্ধমান

অঞ্চলেই বাস, এর সঙ্গে একজন ভদ্রবেশধারী যুবক ছিল, সে দিন এই অরণ্যস্থিত অপর সন্ন্যাসীর আশ্রমে অবস্থিতি করিতে দেখিয়াছি।

যুবতী। হাঁ সত্য বটে, এর নাম রঘুনাথ, পাপীষ্ঠ এখানে কি জন্যে?

তখন হেমন্তকুমারের চৈতন্যোদয় হইল, তিনি পূর্ব্বে বনমধ্যে যে আহত ব্যক্তিকে দর্শন করিয়াছিলেন তাহার রহস্যোদ্ভেদ করিলেন, নিশ্চয় জানিলেন কৃষ্ণ সোজা লোক নহে। আহত যুবক ইহার হাতেই আহত হইয়াছিল, সে রাত্রিতে হেমন্ত আর সে কথা যুবতীকে ব্যক্ত করিলেন না, ভাবিলেন কৃষ্ণ এখনও জীবিত আছে, সেই আশ্রমস্থিত যাবতীয় সন্ন্যাসী যদি ছদ্ম-বেশী হয়, তবে এখনি প্রতিহিংসার কোন না কোন আশু উপায় দেখিবে। ও কথায় কোন উচ্চবাচ্য না করিয়া যুবক যুবতী দক্ষিণ দিক লক্ষ্য করিয়া যে পথ সম্মুখে পাইলেন, তাহা দিয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

—:—

তিলোত্তমা।

আলাটী রাজবংশের দৌহিত্র হরনাথ মুখোপাধ্যায় ঐ গ্রামেই বাস করিতেন, তিনি বিলক্ষণ বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন। রাজকার্য্য সম্পাদনে তাঁহার বড় দক্ষতা দেখিয়া রাজা তাঁহাকে আপন মন্ত্রীত্বে বরণ করিয়া নিজ সভাতেই রাখিয়া ছিলেন, হরনাথ রাজ-বংশের দৌহিত্র, সম্বন্ধে রাজার ভাগিনেয় হইতেন, এজন্য রাজকর্ম্মচারী হইয়াও রাজ অন্তঃপুরে যাইতে কোন বাধা ছিল না. আবশ্যক হইলে অন্দরেও যাইতেন রাজরাণীও তাঁহাকে বড় ভাল বাসিতেন। রাজবাটীতে কোন উৎসবাদি হইলে হরনাথের পরিবারস্থ সকলেই আসিয়া উৎসব সমাপন দিবসেরও দুই তিন দিন পর পর্য্যন্ত রাজবাটীতে অতিবাহিত করিতেন, হরনাথের একটী সুন্দরী কন্যা ছিল তাহার নাম তিলোত্তমা। এইরূপ রাজবাটীতে সদা সর্ব্বদা গতিবিধি থাকায় বালিকা কাল হইতেই রাজদুহিতা প্রভাবতীর সহিত

তিলোত্তমার প্রণয় জন্মিয়াছিল। তাই পরিবারের অন্যান্য লোকেরা কার্য্যানুরোধে রাজবাটীতে না যাইলেও তিলোত্তমা অবসর কাল প্রভাবতীর সহিতই অতিবাহিত করিতেন। রাজাও প্রভাবতীর সহিত তিলোত্তমার সৌহৃদ্য দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইতেন, এজন্য তিলোত্তমার প্রতি তাঁহার একটু স্নেহও ছিল।

হরনাথ কুলীন ব্রাহ্মণ; কন্যাটীর বয়স নয় দশ বৎসর না হইতে হইতেই বিবাহের জন্য অত্যন্ত চিন্তিত থাকিতেন, তখন মনে করিলেই এ দেশে ভাল কুলীন পাত্র পাওয়া যাইত না, দূর দেশ হইতে নবগুণবিশিষ্ট-দিগের বংশধর আনাইয়া প্রভূত সম্পত্তি না দিলে আর কন্যাকে ভাল ঘরে দেওয়া যাইতে পারিত না, হর-নাথের সে অভাব ছিল না, সবে মাত্র তিলোত্তমাই তাঁহার সন্ততি, সুতরাং তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি এক-মাত্র কন্যার জন্যই নির্দ্দিষ্ট ছিল। তিলোত্তমা প্রভা-বতীর সহিত একত্রে থাকিয়া বেশ লেখা পড়া শিখিযা ছিলেন। তাহারি মনের ভাব অন্য প্রকার ছিল, তিনি জানিতেন নির্দ্ধন কুলীনপাত্র অপেক্ষা বিদ্যালোক সজ্জিত সুপুরুষ অধিক বাঞ্ছনীয়। এজন্য পিতা বিবা-হের কথা উত্থাপন করিলেই বিরস বদনে ভূ-পানে দৃষ্টি ক্ষেপ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িতেন, কৌলিন্য বিবাহে তাঁহার সম্মতি ছিল না।

ক্রমে তিলোত্তমার বয়স বৃদ্ধি হইতে লাগিল, শরীরে যৌবনের খেলা দৃষ্ট হইতে লাগিল, নূতন লাবণ্যে দেহ খানি যেন হাসিতে লাগিল,—কমনীয় মুখ-কমল প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল, সুকোমল গণ্ডস্থল আরক্তিম ভাব ধারণ করিল, নয়ন যুগল বিস্ফুরিত ভাব ধারণ করিয়া জগতের প্রিয়বস্তু দর্শন জন্য যেন খঞ্জনবৎ নৃত্য করিতে লাগিল। ভ্রূযুগ বৃত্তার্দ্ধরূপে শোভিত হইয়া স্ত্রীজাতি সুলভ লজ্জাশীলতা রক্ষার জন্য ঊর্দ্ধদৃষ্টি রোধ করিয়া বসিল। ললাটদেশ ঈষৎ উন্নত হইয়া মুখখানিকে সুন্দর করিয়া সাজাইল, ঘন কৃষ্ণবর্ণ কেশরাশি শিরোদেশে অগণিত ভ্রমরপুংক্তির ন্যায় শোভা ধারণ করিল, গলদেশের মাংসপেশী সমুদায় স্ফূর্ত্তিবিশিষ্ট হইয়া তাহার গোলত্ব সম্পাদন করিয়া দিল। বাহুদ্বয়ের শিরা সকল ঢাকিয়া গেল। নিতম্ব ও বক্ষঃস্থল কটিদেশের মাংস আকর্ষণ করিয়া লইল তাহাতেই কটি অতিশয় ক্ষীণ হইয়া পড়িল। দেহের ভারে আর গমনের চঞ্চলতা রহিল না। হরনাথ কুলীন ব্রাহ্মণ, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কন্যার উপযুক্ত পাত্র না পাওয়ায় অতিশয় চিন্তাযুক্ত হইতে লাগিলেন, নানা স্থানে ঘটকগণ প্রেরিত হইয়াছিল, কিন্তু সকলেই অকৃতকার্য্য হইয়া কেহ বা বয়োধিক, কেহ বা সরস্বতী-দ্বেষী পাত্রের সন্ধান লইয়া রাজধানীতে প্রত্যাগত হইল; হরনাথের

মনোমত পাত্রের সন্ধান হইল না। পরিশেষে তিনি স্বগ্রামবাসী অতি ধনবান নিধিরাম চট্টোপাধ্যায়ের পুত্রের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। নিধিরামের পুত্রের নাম কৃষ্ণচন্দ্র। সে নামের সহিত চেহারার তুলনায় সম্পূর্ণ বিপরীত, ধনবান লোকের ঘরের ছেলেরা যাদৃশ লেখা পড়া শিক্ষা করিলে, কষ্টে স্৷ষ্টে পৈতৃক সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারে কৃষ্ণের সেরূপ বিদ্যাবুদ্ধিরও অভাব, অতি কষ্টে অনেক বিলম্বে নাম সহি করিতে পারিলেও তাহা প্রায় সোহরেই চলিত। নিধিরামের একমাত্র পুত্র সুতরাং অনুরোধে তাহাকে কিছু বলিতেও পারিতেন না। বড় মানুষের ছেলেরা লেখা পড়া না শিখিলে যে সমুদায় দোষ আসিয়া জুটিয়া থাকে, কৃষ্ণচন্দ্রের তাহার কিছুরই অভাব ছিল না।

এক গ্রামে বাস, কাজেই কৃষ্ণের সমস্ত দোষ গুণের কথা তিলোত্তমার জানিতে বাকী ছিল না। তাঁহার যে সখীর সহিত একত্র বাস, তিনি কন্দর্পের ন্যায় রূপবান, ধূর্জ্জটীর ন্যায় উদার এবং বৃহস্পতির বিদ্বান পতি না পাইলে বিবাহ করিবেন না প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। এমন অবস্থায় তিনি কৃষ্ণকে বিবাহ করিতে কোনমতে পছন্দ করিতেন না। পিতা বিবাহ দিবার কথা তুলিলেই নীরবে কাঁদিয়া গণ্ডস্থলে তরঙ্গিনী প্রবাহিত করি-

তেন, দুই এক দিন নিরাহারে থাকিতেন, আবার বিবাহের কথা না থাকিলেই, এক একবার হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইতেন। হরনাথ মহাবিপদে পড়িলেন, এই সময়েই প্রভাবতীর নিরুদ্দেশের কথা রাজবাটীতে প্রচারিত হইল। এই সংবাদে হরনাথ সর্ব্বদাই চিন্তিত কি হবে, কিসে কন্যাটীর শুভবিবাহ ক্রিয়া সম্পাদন করিবেন। রাজবাটীতে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল, পূর্ণযৌবনা অবিবাহিতা কন্যা রাত্রিকালে কোথায় চলিয়া গেল,—কিন্তু প্রভাবতীর চরিত্রে কখন কোন কলঙ্ক ছিল না, এজন্য কেহ অন্য কোন বিভীষিকার আশঙ্কা করিতে পারিল না।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

তিলোত্তমার শুভদর্শন।

দুর্ব্বিষয়াসক্ত কৃষ্ণকে বিবাহ করিতে হইবে এই চিন্তায় তিলোত্তমা সদা শঙ্কিতা, চিন্তিতা, অন্যমনা, কি করেন? ভদ্রলোকের কুলকামিনী সদাই অন্তঃপুর নিরুদ্ধা, নিজে যে কোন কিছু করিতে পারেন তাহারও সম্ভাবনা কম।

বেলা প্রায় শেষ, আকাশে দিনমণি অতি হীনবল, বৃক্ষ, পৃথিবী, আকাশ সুবর্ণকিরণে রঞ্জিত, পাখীরা কোলাহল শব্দে আকাশ পথ অবলম্বন করিয়া আপন আপন কুলায় গমন করিতেছে। কৃষকগণ আপনাদের কার্য্য শেষ করিয়া গ্রাম প্রবেশ করিতেছে, পল্লীগ্রামের স্ত্রীলোকেরা বেশ বিন্যাস করিয়া গাত্র ধৌত করিতে যাইতেছে। তিলোত্তমা সঙ্গতিপন্ন লোকের কন্যা হইলেও এখনও অবিবাহিতা, এজন্য কখন কখন বাহিরে বেড়াইতে পাইতেন, সর্ব্বদা অন্তঃপুর মধ্যে কাল কাটাইতে হইত না। গ্রীষ্মকাল,—দুঃসহ গ্রীষ্ম,

সন্ধ্যাকালে গাত্র ধৌত না করিলে রাত্রিতে নিদ্রাসুখ ভোগের আশা করা যায় না, কিন্তু তিলোত্তমার গাত্র ধৌত করিতে যাওয়া ক্লেশমাত্র, যেহেতু তাহার অন্তরে যে অগ্নি সর্ব্বদা জ্বলিতেছিল, শরীর স্নিগ্ধ হইলেও সে জ্বালা নিবৃত্ত হইবার নহে। তিলোত্তমা হাসিতে হাসিতে নানা কথা কহিতে কহিতে সখীদিগের সহিত পুষ্করণীতে যাইতেছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন, একদল পদাতিক পশ্চাতে একজন অশ্বারোহী যুবা সেই দিক দিয়া গ্রাম প্রবেশ করিতেছেন। তিলোত্তমার সঙ্গিনীগণ অনেকেই যুবতী, সেই গ্রামের বধূ এজন্য তাহারা সকলেই অবগুণ্ঠনবতী হইয়া সরোবরঘাটে যাইল, তিলোত্তমা অবিবাহিতা আলটীতেই পিত্রালয় এজন্য গ্রামের কাহাকেও লজ্জা করিতে হয় না, তাহাতেই অনিমেষনয়নে সেই অশ্বারোহী অপরিচিত পুরুষকে সুখে দেখিবার কোন বাধা রহিল না। যখন তিলোত্তমা অশ্বারোহী যুবকের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন তখন যুবক অশ্বচালনে অন্যমনা ছিলেন। পুষ্করণীর ঘাটের নিকট অশ্ব উপস্থিত হইবামাত্র তিলোত্তমার মনমোহিনী মূর্ত্তিটী অগ্রেই তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। দৃষ্টিমাত্র যুবকের চিত্ত তিলোত্তমার প্রতি আকর্ষিত হইল, মুখ হাত ধৌত করিবার ছলে পুষ্করণীর ঘাটে নামিয়া মুখ হাত ধৌত

করিতে করিতে ও উঠিয়া আসিতে আসিতে বার বার যুবতীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, ভাবভঙ্গী দেখিতে লাগিলেন। তিলোত্তমা তখনও অবিবাহিতা, যতই লেখা পড়া শিখুক, এখনও কোরক অবস্থা; বয়োধিকাদিগের ন্যায় মুখে চোখে মনের ভাব ব্যক্ত করিতে শিক্ষা করেন নাই, সুতরাং লজ্জায় অবনত মুখে রহিলেন, তিলোত্তমার বয়স অনুমানে যুবক তাহাকে বিধবা বলিয়া জানিলেন, তখন তাঁহার সকল আশা সকল ভরসা লোপ পাইল, নতুবা আকারগত সৌসাদৃশ্যে তাঁহাকে উচ্চবর্ণ সম্ভূত বিবেচনা হইয়াছিল।

মুখ হাত ধৌত করা হইয়াছে, বস্ত্রাদি সংযত করা হইল, আর কোন ওজর নাই, কাজেই অশ্বারোহণে অগ্রসর হইতে হইল, অশ্বটী সুধীর, এজন্য কখন ও বজ্জু শিথিল কখন বা ঈষৎ আকর্ষণ করিয়া অশ্বটীকে চঞ্চল করিয়া তুলিলেন, যেন অশ্ব নিজ পৃষ্ঠে যুবককে আরোহণ করিতে দিতে অস্বীকৃত। ভদ্রলোকের কুলাঙ্গনাগণ দণ্ডায়মান, অশ্বের ওজর আর কতক্ষণ চলে, পরিশেষে অগত্যা তাঁহাকে অশ্বারোহণ করিতে হইল। অশ্বারোহণ কালে যুবক দেখিলেন, তিলোত্তমা অধোবদনে বক্রদৃষ্টিতে যুবককে দেখিতেছেন, পাছে যুবকের দৃষ্টি পড়ে, এজন্য এক একবার আবার দৃষ্টি ফিরাইয়া লইতেছেন।

যুবক অশ্বারোহণে ক্রমে গ্রামে প্রবিষ্ট হইলেন বটে কিন্তু তাহার মন পুষ্করণী ঘাটে যুবতীর নিকটেই রহিল; এজন্য এক একবার পশ্চাৎ মুখ ফিরাইয়া যতক্ষণ সেই পুষ্করণী, পুষ্করণী ঘাটের অশ্বত্থ বৃক্ষ নর্জর হইতে লাগিল ততক্ষণ কোনমতে অশ্ব বেগে চালাইতে পারিলেন না, বরং তিলোত্তমার পুনর্দ্দর্শন ইচ্ছায় এক একবার পথ ভ্রান্তির ছলে বিলম্ব করিতে লাগিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল,—আকাশ তিমিরাবৃত হইয়া উঠিল, প্রান্তর মধ্যে বিলম্ব করিলে পাছে গ্রাম প্রবিষ্ট হইয়া পান্থাবাস খুজিয়া লইতে কষ্ট হয়, বিশেষ সমভিব্যাহারী পদাতিকগণ অগ্রসর হইয়া কোথায় গেল এই সকল চিন্তায় আর বিলম্ব করিতে না পারিয়া যুবক অশ্ব চালনে অবিলম্বে আলাটীর বাজারে উপস্থিত হইলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ভালবাসা।

পুষ্করিণীঘাটে এই অপরিচিত যুবকটীকে দেখিয়া অবধি তিলোত্তমার মন অধীর হইয়াছিল, যুবক কে? কোথায় নিবাস, কিরূপ বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন, কি জন্যই বা এখানে আগমন, এই সকল জানিতে যুবতীর মন বড়ই ব্যগ্র হইয়াছিল। এক একবার মনে ভাবিতে লাগিলেন, অপরিচিত যুবকের প্রতি কি এমন আশা আছে যে তাহার আশা পূর্ণ হইতে পারে। তাঁহার জাতি, বিদ্যা, ঐশ্বর্য্য কিছুই জানা নাই, যেরূপ ভাব ভঙ্গী তাহাতে যে যুবক এখনও অকৃতদার তাহাও কোনমতে বোধ হয় না। এইরূপে যুবতীর মনে সমুদ্রতরঙ্গের ন্যায় অনেক সন্দেহ, অনেক বিভীষিকা উদয় হইতে ও মিলাইয়া যাইতে লাগিল। গাত্রমার্জ্জনা করিতে করিতে যুবতী আপন মনে এই সকল তোলাপাড়া করিতেছেন। মনের সহিত কাজ নয় এক কাপড় একশ বার জলে

ভাসাইতেছেন, আবার টানিতেছেন, আবার ভাসাই-তেছে, এক গাত্র সহস্র বার মার্জ্জনা করিতেছেন ততই যেন মন উঠে না আবার মাজিতেছেন, হয় ত অঙ্গ মার্জ্জনা করিতে করিতে এক দৃষ্টিতে অশ্বত্থ বৃক্ষে বিহ-ঙ্গম মিথুনের প্রণয়ক্রীড়া দেখিতেছেন। এই জন্য সঙ্গিনিগণ বিদ্রুপচ্ছলে নানা কথা বলিতে লাগিল, কেহ বা বলিল, "এত বাহারেও বর জুটিতেছে না," কেহ বলিল এখনি এমন, বিয়ে হলে তিলোত্তমার মাজাব চোটে গায়ে মলা থাকা ভার হবে। অন্য কেহ সকলের মত খণ্ডন করিয়া বলিল, "তোরা সব জানিস্, তিলো-ত্তমার সেই ঘোড়ায় চাপা পুরুষটীকে বিয়ে কর্‌বে বলে ভাব্‌চে।"

তিলো। (সলজ্জায়) আপনার মনের মত সকলকে মনে করিস্ বুঝি, তোর বুঝি ইচ্ছা হয়েছে?

সঙ্গি। না ভাই, তুই নাধুতে আস্‌বার সময় ত বেশ হাস্‌তে হাস্‌তে এলি, আর সেই পুরুষটীকে দেখে অবধি কেন আন্‌মনা হ'লি? তাই আমি বল্‌ছিলাম।

তিলো। কুলীন বামুনের ঘরের মেয়ে, এমন কি কপাল করেছি ভাই, যে অমন বড় লোকে বিয়ে কর্‌বে? বাবার যদি মত হয় ত, এমন একটা বর আনবেন, যেন তাকে চিরকালটা ভাত কাপড় দিয়ে প্রতিপালন কত্তে হবে।

সঙ্গি। কেন তোরত ভাই বড়লোকেই সম্বন্ধ হচ্ছে

তিলো। কবে আবার শুন্‌লি তুই! বড় ঘরে সম্বন্ধ হচ্ছে।

সঙ্গি। কেন সকল লোকেই জানে, আমি কি নূতন বল্‌চি?

তিলো। কোথায়?

সঙ্গি। আহা! নেকা আর কি? যেন কিছুই জানেন না।

তিলো। সত্য ভাই; তোর দিব্বি আমি জানিনা।

সঙ্গি। কেন কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে?

তিলো। কপাল আর কি? বাবা তবে হাতে পায়ে দড়ি বেঁধে গলায় একটা কলসী দিয়ে আমায় ভরা নদীতে ফেলে দিন না।

সঙ্গি। কেন ভাই! কৃষ্ণ কি মন্দ? যেমন হ'ক তার বাপের অনেক বিষয় আছে, অত ধন, মনের মত অলঙ্কার দশখানা পাবি, একা শাশুড়ীর বৌ হবি, কত আদর হবে, কৃষ্ণকে দেখ্‌তেও ভাই মন্দ নয়।

তিলো। না, দেখ্‌তে মন্দ নয়, মুখে, গায়ে, গোটাকতক চুণের ফোঁটা দিয়ে বেগুণ ক্ষেতে বসিয়ে দিলে চলে। তার বিষয় আশয় ভাই। তাকেই থাকুক, অমন পোড়া বিষয় ভোগে কাজ নাই।

সঙ্গি। পুরুষ হাজার কুচ্ছিত হলেও সুন্দর, এত

দেখে শুনে ত ভাই মেয়ে মানুষের বিয়ে করা চলে না, বাপ মা যাকে দেখেন, তাকেই কন্দর্প জ্ঞান কত্তে হবে।

তিলো। এ ত ঔষধ খাওয়া নয় যে তিত হউক, মিষ্ট হউক, একবার চোখ নাক টিপে খেয়ে উদরস্থ কত্তে পাল্লে উপকার হবে? এ নিম যে ভাই দুবেলা মুখে কোরে থাক্‌তে হবে, অতএব কিরূপে প্রাণ বাঁচবে?

সঙ্গি। রূপে গুণে মনোমত কই পাওয়া যায় ভাই।

তিলো। তা বলে জ্বলন্ত আগুণে কি করে জ্বলবো বল? কৃষ্ণের যা বিদ্যাবুদ্ধি তা তো তোমাকে আমাকে ছাপা নাই।

সঙ্গি। অবিবাহিতাবস্থায় অমন থাকে, বিয়ে হোলে আর সেটা থাক্‌বে না, কি কর্‌বি ভাই, ও হতে ভাল ত আর পাওয়া যাচ্চে না, ওই মন্দ কি, তোর কেমন পছন্দ, কে জানে ভাই।

তিলো। তোর চোখে লাগে ত না হয় তুই কৃষ্ণকে বিয়ে কর্‌না।

সঙ্গি। ভাল বল্লেই কি বিয়ে করবার ইচ্ছা হয়? এ যে বিষম কথা, তবে তোমার কাছে আপনার ভিন্ন অপর পুরুষকে ভাল বল্‌বার যো নাই!

তিলো। তা ভাই গিছে নয়, আপনারটীকে এমনি দেখ্‌তে হবে যে, যেন পৃথিবীতে আর তেমন কেহ নাই।

সঙ্গি। সে ত সকলেই তেমনি দেখে। কে আপনারটীকে মন্দ দেখে?

তিলো। তবে একটী ভাল দেখ্‌লে, তার রূপের কথা বল্‌তে মুখে হ'তে লাল পড়ে কেন?

সঙ্গি। তা বোলে ভাল দেখ্‌লে, ভালকে ভাল বল্‌বে না?

তিলো। তখন আপনারটী কোথায় রইলেন?

সঙ্গি। আপনারটী আপনারই রইলেন, তিনি যেমন তেমনি রইলেন।

তিলো। কিন্তু মনের ভিতর দুটীকে বসাইলে কোনটীকে বেশী আদর করিতে ইচ্ছা যায়?

সঙ্গি। কেন আপনারটীকে।

তিলো। তখন ভালটী কোথা রহিল?

সঙ্গি। তিনি ভালই রহিলেন।

তিলো। তবে তোর কাছে ভাল মন্দের বিচার নাই? সবাই ভাল বল্‌না কেন?

সঙ্গি। আমি কি তা বল্‌চি,—তবে তোর বাপ যে তোকে এত দিন লেখা পড়া শেখালে, সব ভস্মে ঘৃত ঢালা হলো বল?

তিলো। কি বল্‌চিস্ তাই ভাই ভাল ক'রে বল্‌না যদি বুঝতেই না পেরে থাকি।

সঙ্গি। আমার যে ভালটী, তার কি জোড়া থাকতে নাই?

তিলো। ভাল থাক্‌লে তার কি জোড়া দেখে মন ভুলিয়া থাকে?

সঙ্গি। থাকে বই কি, জিনিষ বিশেষ আছে।

তিলো। মনে কর ভাই, তোমার একছড়া হার আছে, আর একছড়া সেই রকম হার পেলে তাকে কি তত আদর কত্তে ইচ্ছা যায়? একগাছা কণ্ঠমালা না পেলে আর সেই হারের উপর মন উঠে না।

সঙ্গি। আচ্ছা ভাই, অমন যদি বুঝ্‌লি তবে তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি বল দেখি, সেই কণ্ঠমালার উপর বিশ হাজার টাকার একগাছা জড়োয়া চিক পলে কি হয়?

তিলো। কণ্ঠমালার উপর যত্ন কত্তে ও ভাল বাসতে ইচ্ছা যায়।

সঙ্গি। তবে ভাই, ভালর ভাল আছে বল? আমার যা আছে তা চেয়ে ভাল দেখ্‌লে তাকে ভাল বল্‌বো না?

তিলো। তা আছে বই কি, কিন্তু আমি এমন ভাল খুঁজি, যে সে ভালর ভাল আর কোথাও না থাকে।

সঙ্গি। তেমনটী পাবে না ;—সেটী তোমার বুঝিবার ভুল।

তিলো। না পাই যেমন আছি তেমনি থাক্‌ব, যে ধন জগতে অপ্রাপ্য সে ধন হাজার খুঁজে কোথায় পাবে।

সঙ্গি। তবে ভাই আজি আসি ?

তিলো। আচ্ছা ভাই আজি আয়, কিন্তু কাল আবার যেন দেখা হয়।



একজন বহুকালের পরিচিত আত্মীয়ের ন্যায় ভাল-বাসিতে ইচ্ছা গেল, দাসীর মন আপনার সঙ্গে সঙ্গে চলিল, কিন্তু পাছে সঙ্গিনীগণ কোন সন্দেহ করে, সে অনুরোধে অধিনী অধিকক্ষণ আপনার প্রতি চাহিয়া থাকিতে পারিল না। অপরিচিত পুরুষকে দেখিবা মাত্র মন তাঁহার অনুসারী হইল, এজন্য মনকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলাম, কিন্তু কিছুতেই প্রবোধ মানিল না। মন যদি ফিরিত, পুষ্করিণীতে মুখ হাত ধৌত করিবার সময় গলদেশে যজ্ঞোপবীত দৃষ্টি করিয়া, আর ফিরিল না। বাটী আসিলাম, দাসীকে গোপনে পরিচয় জানিতে পাঠাইলাম, সে আসিয়া আমার মনের অনুসারী উত্তর দিল। সে জন্য এই পত্রিকা লিখিতে সাহস হইল। দাসী এই রাজধানীর মন্ত্রীকন্যা, কুলী-নের বংশে জন্ম, তাই এ পর্যন্ত অবিবাহিতা পিতার মনোমত পাত্র পাইলেও দাসী কুলের পক্ষপাতিনী নহে। সদা বেশ্যা সহবাসী ব্যসনপ্রিয় গ্রামস্থ জনৈক ধনবান কুলীন পুত্রে দাসীকে সম্প্রদান করিতে পিতা উদ্যত হইয়াছেন; সেই মহা বাটিকায় আন্দোলিত হইয়া দাসী অকুল সংসার-সমুদ্রে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল, লজ্জা হয়, লিখিতে লেখনী চলে না. আজি দিব্য আশ্রয় প্রাপ্ত হইল। প্রার্থনা করি দাসীর অনুরোধ রক্ষার্থে রাজ প্রমোদোদ্যানের আরাম ভবনে, শূন্য নিশীথে

উপস্থিত হইবেন, নতুবা অবলা বধের পাপ অর্শিবে। ধর্ম্মের নিকট কি রাজা কি প্রজা সকলেই সমান।

প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী তিলোত্তমা।

পত্র পাঠে যুবক নিশ্চিন্ত হইলেন, এত উৎকণ্ঠা, এত ভাবনা সকলই নিবৃত্তি পাইল। তখন প্রত্যুত্তর লিখিতে বসিলেন,—

সরল হৃদয়ে!

আপনার দর্শনাবধি আমারও মনে আপনার প্রতি প্রণয় ও একাগ্রতা এককালে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। কিন্তু আমি অপরিচিত পুরুষও বিদেশী, কোনমতে আমার আশার চরিতার্থতা লাভের সম্ভাবনা না দেখিয়া এই পান্থ নিবাসে আসিয়া কত ভাবনা ভাবিতে ছিলাম, ইতিমধ্যে আপনার লিখিত পত্র পাঠে সমস্ত চিন্তা অন্তর্হিত হইল। আমিও এপর্য্যন্ত অকৃতদার পিতা ভবানীপুর অধিপতি "রাজা রামনারায়ণ রায় বাহাদুরের" আদেশে বর্দ্ধমানের তহশিলদার সের আফগান খাঁ বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছি, জানি না কেন তিনি আমায় যাইবার জন্য পিতৃদেবকে লিখিয়া পাঠাইযাছেন। আমার পরিণয়েচ্ছা যাদৃশ বলবতী তাহাতে 'শুভস্য শীঘ্রং' এই মহাবাক্যের

সার্থকতা সম্পাদনে এক মুহূর্ত্তও বিলম্বের ইচ্ছা হয় না। আপনার বিনা প্রার্থনায় দ্বিতীয় বার সাক্ষাতের বাসনা ছিল, যাহা হউক কল্য নিশীথে নির্দ্দিষ্ট স্থানে নিশ্চয় সাক্ষাৎ করিব। একপ অনুকূল ঘটনা জগতের অল্প লোকেরই অদৃষ্টে ঘটিয়া থাকে।

বাধিত,

কুমার রাজ নারায়ণ রায়।

যুবক পাইক হস্তে পত্রখানি দিয়া তাহাকে বিদায় দিলেন, এবং জমাদার ধন সিংহকে ডাকাইয়া কহিলেন কল্য এখানে অবস্থিতি করিবার সমস্ত বন্দোবস্ত করা হয়।

কুমার শয্যায় শয়ন করিয়া সুনিদ্রায় রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। পূর্ব্ব দিকে উষার মধুর হাসি দেখা দিল, উষা জীবমাত্রেরই আদরের সামগ্রী, তাই পক্ষীগণ থাকিয়া থাকিয়া মিষ্টরবে তাহার সাদর সম্ভাষণ করিতে লাগিল। প্রাতঃ কৃত্যাদি সমাপন করিয়া কুমার এই সময় রাজধানী দর্শনে গমন করিলেন, এবং অনতি দীর্ঘকাল মধ্যে চতুর্দ্দিক দেখিয়া বাসায় প্রত্যাগমন করিলেন।

গ্রীষ্মকালের দিন অতিদীর্ঘ, কুমারের মনে রজনীর সত্বর আগমন নিতান্ত বাঞ্ছনীয়, কাজেই প্রতি মুহূর্ত্ত

বৎসীব বোধ হইতে লাগিল, মধ্যাহ্নে আহারের পর নিদ্রা, নিদ্রা ভঙ্গের পর অশ্বারোহণে রাজধানী প্রদক্ষিণ,—তাহাতেও বেলা শেষ হইল না। তখন তত্রত্য রাজার সহিত সাক্ষাৎ করা কর্ত্তব্য বিবেচনায় রাজবাটীতে উপস্থিত হইলেন, রাজা পরিচয়ে তাঁহাকে ভবানীপুর অধিপতির পুত্র জানিতে পারিয়া যার পর নাই সমাদর করিলেন, সামান্য পথিকের ন্যায় পান্থাবাসে পূর্ব্ব রাত্রি যাপন করিয়াছেন এজন্য দুঃখ প্রকাশ করিলেন, বিশেষ রাজা যদিও তাঁহার পিতার বন্ধু নহেন, কিন্তু পরিচিত। কুমার শান্ত, মিষ্টভাষী, বিনয়ী, অল্পক্ষণ কথোপকথনেই রাজাকে যথোচিত সন্তুষ্ট করিলেন। পরিশেষে তাঁহার অনুরোধে রাজভবনে জল পানাদি করিয়া বিদায় লইলেন।

রাজবাটী হইতে প্রত্যাগমন করিতেই কুমারের রাত্রি এক প্রহর অতীত হইয়াছিল। বাসায় আসিয়া বিশ্রাম করিতে না করিতেই রাত্রি প্রায় দুই প্রহর হইল। তখন পৃথিবীতে কোন গোলমাল রহিল না, যেন চেতনা সকলই শূন্য বোধ হইতে লাগিল, কেবল মধ্যে মধ্যে গ্রাম্য চৌকিদারদিগের গম্ভীর শব্দ দূর হইতে এক এক বার শুনা যাইতেছিল।

এমন সময় যুবক একাকী পদব্রজে নির্দ্দিষ্ট উদ্যানে যাত্রা করিলেন, উদ্যানস্থিত পুষ্করিণীতে উপস্থিত হইয়া

দেখিলেন সকলেই নীরব. কেহ কোথাও নাই, কেবল পুষ্করণীজলে এক এক বার মৎস্যের বিহার ধ্বনি শ্রুত হইতেছিল, আর তীরে বৃক্ষ শাখায় এক এক বার নিদ্রিত পক্ষীগণের পক্ষসঞ্চালন শব্দ পাওয়া যাইতেছিল। ঘাটের উপর একটী চাঁদনী, চাঁদনীর উপর বিশ্রামলাভোপযোগী তিনটী সুন্দর ঘর ছিল। কুমার পুষ্করণীতে গিয়া সোপান শ্রেণীতে অবরোহণ করিতেছেন এমন সময় বামাস্বরে কে যেন বলিল "উপরে আসুন" কুমার প্রফুল্ল চিত্তে সোপান শ্রেণী দিয়া চাঁদনীর উপর উঠিয়া গিয়া একটী গৃহে প্রবেশ করিলেন, গৃহটী সুন্দর এবং সুসজ্জিত; দক্ষিণ দিকের বাতায়ন দ্বার মুক্ত করিলেই নিম্নে, নিকটে পুষ্করণীর জল,—বাতায়ন গুলির সমোচ্চ দুই খানি পর্য্যঙ্ক গৃহের দুই ধারে সুন্দর সজ্জায় শোভিত। সম্মুখ ভাগে এক খানি দশভুজার চিত্রপট, তাহার চিত্র কৌশল এমনি অদ্ভুত দেখিলেই বোধ হয় যেন দৈত্যকুলঘাতিনী শৈলসুতা অসুরহৃদয়ে শেল বিদ্ধ করিয়া ঠিক যেন মৃদুহাসি হাসিতেছেন। পশ্চিম দিকের দেওয়ালে শ্রীকৃষ্ণের গোপাঙ্গনা-সহ-বিহার অতি সুন্দর চিত্রে চিত্রিত রহিয়াছে। পূর্ব্বদিকে মহাদেব সহ পার্ব্বতির বিবাহের এক খানি সুন্দর চিত্রপট, ধূর্জ্জটীশিরে বিবাহকালোপযোগী মুকুট; কর্ণে ধুস্তুর কটিতে দ্বিপীচর্ম্ম পতনোন্মুখ, বরণ

করিতে করিতে বরের দিগম্বর মূর্ত্তি দেখিয়া কামিনীগণ কেহ বা অধঃগ্রীবা, কেহ বা বিমুখী হইয়া দণ্ডায়মানা, নিকটে কুমারী পার্ব্বতী পানপত্র দ্বারা মুখাচ্ছাদন করিয়া উপবিষ্টা। দক্ষিণ দেওয়ালে ভগবতী দিগম্বরী মূর্ত্তিতে নিশুম্ভ মুণ্ড হস্তে দণ্ডায়মানা। ঘরের মেজেটী সুন্দর গালিচায় মোড়া, উপরে দুই সারি করিয়া দশটী বেল লণ্ঠন, মধ্যে একটী বেলয়ারি ঝাড়। রাজকন্যা প্রভাবতী এই খানে থাকিয়াই মহাদেবের আরাধনায় সময় ক্ষেপণ করিতেন। ইহার অনতিদূরেই রাজবাটী।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যুবতী যৌবন সুলভ চপলতা এখনও শিক্ষা করেন নাই, হেঁট মুখে মৃদু হাসির সহিত কথার ফাঁদুনি জানে না। তাই যুবককে গৃহ প্রবেশ করিতে দেখিয়া, বিনীত ভাবে কহিলেন, “আসুন! এই পর্য্যঙ্কে উপবেশন করুন।” এই আড়ম্বর শূন্য অভ্যর্থনায় কুমার যথোচিত আনন্দ লাভ করিয়া কর্ণ-যুগল পরিতৃপ্ত করিলেন, এবং উপবেশন করিয়া যুবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি ভাল ছিলেনত?

যুবতী। যদিও না ছিলাম, আপনার দর্শনে সম্পূর্ণ সুস্থ ও সুখী হইলাম।

যুবক। এরূপ বিনয় বাক্যে বাধিত হইতে হইল। অপরিচিতের প্রতি এতাদৃশ সম্ভাষণ সৌভাগ্যের বিষয় বটে।

যুবতী। দাসী বাক্ চাতুরী জানে না, কথায় সন্তুষ্ট করিব এমন সাধ্য কি ?

যুবক। আপনার দর্শনেই যথেষ্ট অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছি, বৃথা বাক্য ব্যয়ের আবশ্যক নাই।

যুবতী। আপনি রাজপুত্র, আমি সামান্য ব্রাহ্মণ-কন্যা যদি অনুগ্রহ করিয়া একটী অনুরোধ রক্ষা করেন তবে—(নিস্তব্ধ)

যুবক। নিস্তব্ধ হইলেন কেন ?

যুবতী। (কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া) যখন হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া, ও পরিণাম না ভাবিয়া, পত্র লিখিয়া বসিয়াছি তখন লজ্জা করা বিফল।

যুবক। তবে বলিবার বাধা কি ?

যুবতী। তাহা হইলে দাসী চিরদিন শ্রীপদে বাধিত থাকে।

যুবক। যখন পিতার নিকট বিদায় লইয়া যাত্রা করি তখনই দক্ষিণাঙ্গ স্পন্দিত হইতে লাগিল, মনে করিলাম বিধাতা কি সৌভাগ্য প্রদান করিবেন জানি না, কল্য গ্রাম প্রবেশ কালেই আপনার দর্শন পাইয়া, কোনমতে সে আশাকে মনোমধ্যে স্থান দিতে পারিলেন না। শেষে তাহাতেই পরিণত হইতেছে। অমৃতে কাহারও অরুচি হয় না, বহুমূল্য রত্নকে কে অনাদর করে ?

যুবতী। তবে বিলম্ব করিয়া দাসীকে আর সন্দেহ দোলায় দোলাইবেন না।

যুবক। আমি বৰ্দ্ধমান যাইতেছি ত্বরায় প্রত্যাগমন করিব। রাজধানীতে পৌছিয়া বন্ধুগণের দ্বারা পিতৃদেবের সমীপে পরিণয় কথা উত্থাপিত করিয়া আপনাকে সহধৰ্ম্মিনী করিব; নতুবা অন্য উপায় নাই।

যুবতী। (নীরব)

যুবক। নীরব রহিলেন যে?

যুবতী। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) তবে জানিলাম এখনও ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয় নাই।

যুবক। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি জীবন থাকিতে আপনি ভিন্ন অন্যের পাণি গ্রহণ করিব না।

যুবতী। তাহাতেও দাসী সন্তোষ লাভ করিতে পারিতেছে না।

যুবক। আপনি যে, বিলম্বের আশঙ্কা করিতেছেন, তাহা কোন মতে ঘটিবার নহে। এমন কি সপ্তাহ মধ্যে প্রত্যাগমন করিব, বরং এমন স্বীকার করিতে পারি, যে প্রত্যাগমন কালে আপনার সহিত নিশ্চয় সাক্ষাৎ করিয়া যাইব।

যুবতী। পূৰ্ব্বাপর ভাবিয়া দাসী তাহাতেও সাহসী নহে। জানি কি পাছে প্রিয় সহচরী প্রভাবতীর দশা

ঘটে। বোধ হয় শুনিয়াছেন রাজার এক কন্যা আজি কিয়দ্দিবস নিরুদ্দিষ্টা হইয়াছেন, বালিকা কাল হইতে তাঁহার সহিত একত্র শয়ন, একত্র ভোজন ছিল, তাহাতেই তাঁহাতে অতিশয় অনুরক্ত ছিলাম। জানেনইত বাল্যকালের প্রণয় প্রস্তরের অঙ্ক। সর্ব্বগুণ সম্পন্ন রাজপুত্র না পাইলে তিনি বিবাহ করিবেন না এই প্রতিজ্ঞায় উদ্যানের অপর পার্শ্বে মন্দিরে যে এক শিবলিঙ্গ আছেন তাঁহারই পূজায় তিনি দেহ মন সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই যে বিশ্রাম গৃহটী তাঁহারই জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল।

যুবক। এ অপেক্ষা সুবিধাজনক উপায় আর কিছু দেখিতে পাই না।

যুবতী। যদি থাকে?

যুবক। তাহাতে স্বীকৃত আছি।

যুবতী। আছেন?

যুবক। আছি।

যুবতী। আপনি এই রাত্রিতেই গান্ধর্ব্ব মতে আমাকে বিবাহ করুন।.

যুবক। কলিতে ত গান্ধর্ব্ব বিবাহ নাই।

যুবতী। স্বয়ম্বর আছে?

যুবক। ভাল নাই।

যুবতী। নাই কেন? যবন রাজ্যের অত্যাচারে ও পুনঃ পুনঃ রাষ্ট্র বিপ্লবে সে সকল উঠিয়া গিয়াছে।

যুবক। থাকিতে পারে। তাহাতে আপনার কি ?

যুবতী। আমি স্বয়ম্বরা।

যুবক। স্বয়ম্বরে আপনার পিতা মাতার সম্মতি জানাত আবশ্যক ?

যুবতী। মাতার সম্পূর্ণ মত আছে, পিতার না থাকিতে পারে, তায় কিছু আসে যায় না। আমার সহোদর নাই যে তাহার জন্য কুল রক্ষা করিতে হইবে, আর থাকিলেও কে কোথা পরের জন্য আপনার চিরজন্মের সুখ পদাঙ্গুষ্ঠে ঠেলিন করে ?

যুবক। তবে আমার আপত্তি কি আছে ?

যুবতী। অনুগ্রহ করিয়া গাত্রোত্থান করুন।

যুবক। কোথা যাইতে হইবে ?

যুবতী। ঐ দেব মন্দিরে চলুন। যদিই স্বয়ম্বর সিদ্ধ না হয়, দেবমূর্ত্তির সমীপে আমাদিগের পরস্পরের শুভ পরিণয়ের অঙ্গীকার হইয়া থাকুক।

যুবক। তাহাতে ক্ষতি নাই, আপনার যাহাতে মন সন্তুষ্ট থাকে তাহাই করুন।

যুবতী। তবে আসুন।

উভয়ে নিস্তব্ধ নিশীথে অন্ধকার ভেদ করিয়া নিকটবর্ত্তী শিবমন্দিরে চলিলেন, তিলোত্তমা দূর হইতে দেখিলেন মন্দিরের প্রবেশ দ্বারে যেন একটী মনুষ্য মূর্ত্তি দণ্ডায়মান রহিয়াছে; চতুর্দ্দিকে উচ্চ প্রাচীর

বেষ্টিত, পুষ্করণী ঘাটের প্রবেশ দ্বার অবরুদ্ধ, তাহাতে আবার ঘোর তমসাচ্ছন্ন নিশীথ সময়। কিরূপে মনুষ্য প্রবেশ করিল এই চিন্তা করিতেছেন, কুমার যুবতীর সন্দেহ জানিয়া অগ্রসার হইয়া দেখিলেন সেটী মনুষ্য মূর্ত্তি নহে, মন্দিরের একটী স্তম্ভ, তখন যুবতী আপন প্রণয়ীর সহিত মন্দির প্রবেশ করিলেন। "দেবাদিদেব সম্মুখে বলিলেন, দাসী আজি হইতে ভবানী পুরের রাজ কুমার ব্যতীত অন্য কাহাকেও জানেনা, ভ্রমেও যদি অন্য কাহাকেও মনে স্থান দেয়, পরকালে নিশ্চয় নরক বাস হইবে। যুবকও তিলোত্তমার প্রতিজ্ঞা পোষক বাক্যে অঙ্গীকার করিলেন, আমিও অত্যাবধি তিলোত্তমা ভিন্ন অন্য কন্যার পাণি গ্রহণ বাসনা পরিত্যাগ করিলাম। কখনও যদি বিপরীত ইচ্ছা করি, তবে যেন পরলোকে ঈশ্বর নরক বাস নির্দ্দিষ্ট করেন।"

উভয়ে মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া বিশ্রাম গৃহে প্রবেশ করিলেন।

তিলোত্তমার সহিত কথা কহিয়া কুমারের আর আশা নিবৃত্ত হয় না, একটী কথা কহিলে কুমার পাঁচটীর উত্তর দেন। কথায় কথায় রজনী অবসান হইল। নিদ্রিত ব্যক্তিদিগের চক্ষে নিদ্রার প্রভুত্বার হ্রাস হইয়া আসিল। অন্তরীক্ষে নক্ষত্র মণ্ডল সমস্ত

রাত্রিতে দীপকের ন্যায় জ্বলিতেছিল ক্রমে মিট মিট করিতে লাগিল, পূর্ব্বের মত আর উজ্জ্বল জ্যোতিঃ রহিল না। তরুর নিবিড় পল্লবিত শাখায় পক্ষীগণ আপনার মধুর গীতে রাত্রির নীরবতা ভঙ্গ করিতেছে। দেখিলেই বোধ হয় রাত্রি শেষ হইল। প্রভাতে ব্রাহ্মণ গণ কুসুমোদ্যানে আসিবেন এই আশঙ্কায় যুবতী কুমারের নিকট বিদায় প্রার্থনা জানাইলেন এবং বলিলেন "দাসীকে ভুলিবেন না আপনার সঙ্গ ছাড়িতে কোন মতে ইচ্ছা হইতেছে না, নলিনী কি দিনমণির অস্ত গমনে কখন সুখী হয়?"

অতি আদরের ধন প্রণয় রতন,
করে কি প্রেমিকে কভু তারে অযতন?
কিন্তু বিধি প্রতিবাদী চির দিন তায়,
মিলন সুখের আগে বিচ্ছেদ ঘটায়।

জন্মাবধি এত সুখ, এত সাচ্ছন্দ্য, এত আশা, এত ভরসা দাসীর জীবনে কখন ঘটে নাই। আমার এক মুহূর্ত্তের জন্য মনে হইতেছে না যে আমি আপনাকে ছাড়িয়া জীবিত থাকিতে পারিব।

কুমার যে অপরিচিতার পুনঃ দর্শন জন্য তত ভাবিত, তত চিন্তিত, থাকিয়া সহজে এই কামিনী

রত্নকে ত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন এমত নহে, কি করেন! কার্য্যানুরোধ, না যাইলে লোকনিন্দা ভয় আছে,—ইচ্ছা না থাকিলেও কুমারকে বিদায় লইতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল, পরিশেষে বিমর্ষ বদনে, তিনি যুবতীর হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন, "প্রিয়তমে! বিবাহ দূরে থাকুক, আমি আপনার পরিচয় জানিবার বিষয়ে উৎসুক হইয়া কিরূপে কাহার নিকটে আপনার সবিশেষ পরিচয় অবগত হইব এই চিন্তায় কাতর ছিলাম, পরে দৈবানুকূলতায় এবং এই অত্যল্প সময় মধ্যে এই আশাতীত, অপূর্ব্ব কল্পিত কার্য্য সংঘটনে বিস্মিত হইয়াছি। এই অযত্ন লব্ধ আকস্মিক সৌভাগ্যের সদ্ব্যবহার না করিতে পারিয়া মনে পরিতাপ হইতেছে। যদি আপনাকে লইয়া রাজধানী প্রত্যাগমন করি, তবে রাজ্য মধ্যে নানা কথা উত্থাপিত হইবে,—লোকে বলিবে রাজপুত্র প্রেমমুগ্ধ হইয়া পিতৃ আজ্ঞা পালনে পরাঙ্মুখ হইলেন। পিতৃদেব নব-বিবাহিত বধূসহ তাঁহার জ্যেষ্ঠ কুমারকে দেখিয়া অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিবেন সন্দেহ নাই, কিন্তু যদি এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার মনে উদয় হয় যে পুত্র প্রণয়ান্ধ হইয়া আমার আজ্ঞা অবহেলন করিয়াছে, তাহা হইলে তখন তিনি আমাকে নিতান্ত অপদার্থ জ্ঞান করিবেন, এই জন্য পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া আপনাকে এখানে

বাধিয়া যাইতে বাধ্য হইতেছি নতুবা কোন মতে আপনাকে সঙ্গে লইতে ক্ষান্ত থাকিতাম না। তবে আজি বিদায় লই।"

এই কথা শুনিয়া যুবতীর মুখ ভাব ও চক্ষু অশ্রু ভাবে ছল ছল করিতে লাগিল; যেন নিবিড় কৃষ্ণ নীরদ রাশি নির্ম্মল গগণে কৌমুদীকে ঢাকা দিল। কামিনীর সুখের নিশি প্রভাত হইল, কুমারকে বিদায় দিয়া ম্লান বদনে পিতৃ ভবনে ফিরিয়া চলিলেন।



চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

গুপ্ত মন্ত্রণা।

পাঠক পূর্ব্বাবধিই কৃষ্ণচন্দ্রের কতক পরিচয় পাই-য়াছেন ; কৃষ্ণ বাল্যকাল হইতেই একলা মায়ের ছেলে, সুতরাং মা বাপের খুব আদরের ; এজন্য রীতিমত লেখা পড়া শিক্ষা করে না। কুলীনের ঘরের ছেলে, বাপের বেশ বিষয় আছে, বিবাহের ভাবনা নাই, কিন্তু মনোমত কন্যা না পাওয়ায় তাহার পিতা আজ পর্য্যন্ত বিবাহ দেন নাই, যখন তিলোত্তমার পিতা কৃষ্ণের সহিত তাহার সম্বন্ধের প্রস্তাব করেন, তখন কৃষ্ণের পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন সকলেই তাহাতে একমত হইয়া উৎসুক হইলেন। তিলোত্তমার রূপগুণ ভিন্ন তাহার সহিত বিবাহ দিবার তাঁহাদের আর উদ্দেশ্যও ছিল, তিলোত্তমা ভিন্ন তাহার পিতার সন্তানাদি ছিল না, হরনাথের পরলোক গমনান্তে সমস্ত বিষয় বিভব তাঁহার কন্যার, সুতরাং তাহাকে বিবাহ দিলে সৌভাগ্য বৃদ্ধির

সম্ভাবনা, কাজেই কোনমতে কাহারও অমত করিবার কিছু ছিল না, কৃষ্ণ তিলোত্তমার সহিত আপন পরিণয়ের কথা শুনিয়া অবধি, কিসে প্রণয়িণীর মনোমত হইতে পারে ইহারই উদ্যোগ করিতে লাগিল, যে হেতু তিলোত্তমার মত স্ত্রীর পাণিগ্রহণ অতি অল্প লোকের অদৃষ্টেই ঘটে, কৃষ্ণ ভাল লেখা পড়া না জানিলেও একথা জানিত। তিলোত্তমা একটী রমণী রত্ন, হরনাথের ঘর আলো করিয়াছিলেন, নিকটের দশ খানা গ্রামে তাহার রূপের কথা আবাল বৃদ্ধের সায়ংকালীন উপকথার অঙ্গ ছিল। এমন যুবতীকে বিবাহ করিতে যে তাহার অতিশয় আগ্রহ জন্মিবে তাহার আশ্চর্য্য কি।

পূর্ব্বে তিলোত্তমার কাছে অন্তঃপুরাঙ্গনা কেহ বিবাহের কথা উল্লেখ করিলে তিনি অধোবদনে থাকিতেন, বড় কথা কহিতেন না, এখন হইতে তিলোত্তমার আর সে ভাব রহিল না, তাঁহার কাছে বিবাহের কথা হইলেই তিনি চোটপাট জবাব দিতেন। এমন নিষ্ঠুর কথায় তাঁহার মাতা বড় কিছু বলিতেন না, এজন্য কেহ কেহ অনুমান করিয়াছিলেন, তাঁহার গোপনে বিবাহের কথা হরনাথ মুখোপাধ্যায়ের পত্নীর অগোচর ছিল না। সে কথা বড় মিথ্যাও নয়, কোন গুপ্ত কথা কোন মতে স্ত্রীলোকের উদরে জীর্ণ হইবার নহে, অল্প দিবসেই

এই কথা দু এক কাণ হইয়া কৃষ্ণের কাণে উঠিল, সে সন্ধান পাইল, তিলোত্তমা স্বয়ম্বরা হইয়া আপনার সম্বন্ধ আপনিই করিয়াছে কিন্তু তাহার পিতার সম্মতি নাই। এখন হইতে দুষ্ট চিন্তা করিতে লাগিল কিসে বিবাহে বিঘ্ন উপস্থিত করে, দু দিন দশ দিন এইরূপ চিন্তার পর মনে কি সিদ্ধান্ত করিয়া মাতুলালয় গমনের ছলে আলাটী ত্যাগ করিয়া চলিল। রঘুনাথ নামে একজন ভৃত্য কেবল মাত্র সঙ্গে গেল।

কুমার রাজনারায়ণ বর্দ্ধমানে পৌঁছিয়া সের আফগানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানিলেন, বীরভূমের পশ্চিম দিকবর্ত্তী পর্ব্বতবাসী সাঁওতালেরা সময়ে সময়ে মুসলমানরাজ্যে আসিয়া বড় অত্যাচার করিতেছে; সেই অত্যাচার নিবারণ করিয়া তথায় শান্তি স্থাপনের জন্য অন্য কেহ উপযুক্ত লোক না থাকায়, তাঁহাকেই সেই কার্য্যে গমন করিতে হইবে। যখন সাঁওতাল-বিদ্রোহ দমনে তাঁহার গমন নিশ্চয় হইল, তখন তিলোত্তমার ভালবাসা, তাহার যত্ন, তাহার ব্যাকুলতা তাঁহার মনে যুগপৎ উদয় হওয়াতে অত্যন্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। পাছে বিলম্ব করিলে রাজ কার্য্যের ব্যাঘাত হয়, এজন্য আর দেরি না করিয়া কুমার বীরভূম অঞ্চলে গমন করিলেন।

কৃষ্ণ বাটী হইতে বাহির হইয়া রঘুনাথকে কহিল

আমার মনোভিষ্ট পূর্ণ করিতে পারিলে তোকে এমন ধন দিব যে আর কখনও টাকার জন্য কর্ম্মকাজ করিতে হইবে না।"

রঘু। ভয় কি মুশাই, আমার বলবিক্রম, বুদ্ধির দৌড় দেখ্‌বেন।

কৃষ্ণ। আমরা দুজনে কিরূপে ততলোকের সঙ্গে পারিব? বলিস্ ত আরও জন কয়েক লাঠিয়াল লই।

রঘু। সে রাজপুত্র, তাহার সঙ্গে তুমি কি লড়াই দিয়ে পেরে উঠবে?

কৃষ্ণ। তবে কিরূপে ইষ্ট সিদ্ধি হয়?

রঘু। তার ভাবনা কি, কলে মেরে দেব। বেশী গোলমাল হলে চল্‌বে না,—আপনি আর আমি থাকলেই সব হবে।

কৃষ্ণ। রাজপুত্রকে ধরে আন্‌তে হবে!

রঘু। তা কি হয়, তার লোক বল কত! তা হলে আপনাকে আমাকে প্রাণ দিয়ে আস্‌তে হবে।

কৃষ্ণ। তবে কি হবে?

রঘু। একবারে সাফকরে ফেলা যাবে।

কৃষ্ণ। দুজনে পারা যাবে?

রঘু। ওঃ। দেখ্‌বেন তখন।

কৃষ্ণ। যদি রাজপুত্রকে খুনকরে তিলোত্তমার

সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে পারিস্, তা হ'লে তোকে আচ্ছা করে খুসী করবো! আর এ যদি পারি তবে আলাটীর লোককে মুখ দেখাব, নতুবা এই যাত্রাতেই যাত্রা, আর ফিরিব না।

রঘু। মুশাই তুমি আমাকে খুসী করো, তা হলে তোমার সব হবে।

কৃষ্ণ। তোকে আমি দুহাজার টাকা দিচ্ছি, না দিই আমি অব্রাহ্মণ।

রঘু। দিচ্চি বলেন কেন, মুখে স্বীকার কল্লেই ত হলো। আমার সাত পুরুষ আপনাদের খেয়ে মানুষ, আপনার বাপ যখন, তাঁর মাতামহের বিষয় পান, তখন তাঁর একজন মাসীর ছেলে ছিল সেও অমনি কোথা-কার বাজার দেওয়ান, না কি,—কর্ত্তা আমাকে বল্লেন "রঘুনাথ কোন গতিকে একে খুন কর্ত্তে হবে," তার সঙ্গে কত হাতী ঘোড়া লোক জন ছিল; এমন হলে তাকে মারলেন। আর আপনিও সে বছর দেখলেন না, মায়াপুরের রাজার এক দল দাঙ্গাবাজ লেঠেলকে মেরে আমরা কয়েক জনে তোমার বাপের কাছে বকসিস পেলাম। দেখতে রঘুনাথকে এমন মেড়ুমারা কিন্তু কাজে পিছবার নয়।

কৃষ্ণ। কর্ত্তাদের সঙ্গে যা হ'বার হ'য়ে গিয়াছে এখন আমার কার্য্য উদ্ধার করিতে পারিলে হয়।

রঘু। আজ্ঞে মুশাই তা দেখবেন তখন, এখন আর সে কথায় কাজ কি?

কৃষ্ণ। তা কর্ত্তে পারলে, যা স্বীকার করলাম তা তো দিবই আর তোর স্ত্রীমরে গেছে, ভাল মেয়ে দেখে, তোর একটী বিয়ে দিব।

রঘু। (দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া) সে আগুন আর জ্বালাবেন না. তার কথা বল্লে আমার মনে তার রূপখানা জেগে উঠে; প্রাণ ছটফট কর্ত্তে থাকে, মুশাই গো! আর সে কথা তুলো না।

কৃষ্ণ। রঘুনাথ! তোর কিসের ভাবনা? আমার কার্য্য সাধন করে দিলে আমি অগ্রে তোর বিয়ে দিয়ে তবে আপনি বিবাহ করব। থাম আর কাঁদিস না।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

নিরাপদে মুক্ত।

সে রাত্রিতে হেমন্ত কুমার প্রভাবতীর উদ্ধার সাধন করিয়া প্রস্থান করেন, সে রাত্রিতে আর কোন বিপদ ঘটে নাই। অবশ্য পার হইতেই তাঁহাদিগের রাত্রি শেষ হইয়া গেল। ভোর হইল, তাঁহারা রামপুর নামক একটী ক্ষুদ্র পল্লীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন প্রভাবতীর মনে আশার সঞ্চার হইল, নিশ্চয় বিশ্বাস জন্মিল, এইবার পিতামাতার নিকট পৌছিবেন, এখন প্রভাবতী আর পিঞ্জরনিরুদ্ধা বিহঙ্গিনী নহেন, মনে যে কত নূতন নূতন কল্পনা উপস্থিত হইতেছে তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না,—এখন আলাটীর রাজ-বাটী, সেই রম্য প্রমোদোদ্যান, সেই স্বীয় সখী তিলোত্তমা সহক্রীড়া, সেই পুষ্করিণী, তাহার বাঁধাঘাট, সেই শিবালয়, রাজধানীর চতুর্দ্দিকে সেই বিস্তৃত প্রান্তর, সকলি এখন নূতন ভাব ধরিয়া প্রভাবতীর মনে খেলা করিতে

লাগিল। যে প্রভাবতী এক দণ্ড এমন কি এক মূহুর্ত্তের জন্য পিত্রালয় ছাড়িয়া কখন কোথাও যান নাই, আজি পাঁচ বৎসর কাল সেই প্রভাবতী বিজন-অরণ্যবাসিনী হইয়াছিলেন, প্রভাবতী সুধীরা তাই বিপদে চঞ্চলা হয়েন নাই, ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়াছিলেন। অন্য হইলে মনের খেদে এত দিন কোন্ কালে আত্ম-হত্যায় জীবন ধন বিসর্জ্জন দিত। প্রভাবতী জানিতেন গ্রহচক্রের নিয়ত পরিবর্ত্তন আছে, কখন কোন রূপে নয় কোন রূপে অনুকূল অবস্থাঘটনায় যে তাঁহার পরিত্রাণ হইতে পারিবে তাহা অনিশ্চিত নহে। প্রভাবতী এখন সিংহ কবলচ্যুতা হরিণী বটে, কিন্তু রঘুনাথের কথা মনে করিয়া এ অবস্থাতেও তাঁহার সর্ব্ব শরীরে বিন্দু বিন্দু স্বেদবারি ক্ষরিত হইতে ছিল, হৃদয়ে রক্তস্রোত প্রবল বহিতেছিল, রঘুনাথ তাঁহার পিতার রাজধানীর লোক, একজন খ্যাতনামা দস্যু! পরস্বাপহরণ, নরহত্যা, স্ত্রীবধ, তাহার নিত্য কর্ম্মের মধ্যে ছিল. কিছুতেই ভয় ছিল না। দেশে এতদূর দুর্বৃত্ত বলিয়া সে প্রসিদ্ধ যে স্বয়ং রাজা পর্য্যন্ত তাহাকে ভয় করিতেন, যে পাছে অসতর্ক অবস্থায় কখন কোন সর্ব্বনাশ করে। রঘুনাথ যে প্রভাবতীর অনুসন্ধানে আসিয়াছিল কিনা তাঁহার মনে একবারের জন্যও এ সন্দেহ হয় নাই। যে হেতু রঘুনাথ বড় অবিশ্বাসী.

লোক, নিজ প্রাণের পুত্তলি কন্যার অনুসন্ধান করিবার জন্য রঘুনাথকে রাজা কখনই বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। হেমন্ত যখন, বিপদে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ রাখিয়া প্রভাবতীকে উদ্ধার করিয়াছেন তাহাতে হেমন্তকে প্রভাবতীর জীবন, মান, ধর্ম্ম সকলি বলা যায়, সুতরাং প্রভাবতীর মনের কথা কিছুই তাঁহাকে লুকাইয়া রাখিবার ছিল না। প্রভাবতীর মন কোন মতে স্থির হইতেছে না, মুখ দেখিলেই বোধ হয় যেন মনে একটা বিষম ভাবনা আছে।

প্রভাবতী অনেক দিন পল্লীগ্রাম দর্শন করেন নাই, তাই গ্রাম্য বৃক্ষ, হরিৎবর্ণ শস্য ক্ষেত্র, গ্রাম্য পুষ্করিণী এবং গৃহপালিত গো মহিষাদিসহ রাখাল বালকদিগকে দেখিয়া তাঁহার মন প্রফুল্ল হইল, অনেক দিন প্রভাবতীর চক্ষে এরূপ সরল চিত্র প্রতিভাত হয় নাই। হ'লে কি হয় মন সুস্থির নয়,—

এখন কেবলই এই চিন্তা যে রঘুনাথ না জানি কি সর্ব্বনাশ করিতেই আসিয়াছিল, অনেকক্ষণ পরে স্নান আহার করিয়া প্রভাবতী নিশ্চিন্ত হইলেন, এবং রঘুনাথের আদ্যোপান্ত পরিচয় দিয়া হেমন্ত কুমারকে মনের ভয়ের কথা বলিলেন। তখন হেমন্ত কুমারের মনে সে সকল কথা নিতান্ত স্ত্রীলোকের কপোলকল্পিত বলিয়া বিশ্বাস হইল না। পূর্ব্বাবধিই তাঁহার মনে

সন্দেহ, যে দেবঘরের অরণ্য মধ্যে যে আহত ব্যক্তিকে দর্শন করিয়া ছিলেন সেই লোমহর্ষণ নাটকের অভিনয়ে রঘুনাথ একজন প্রধান অধিনায়ক।

তাহার পর রঘুনাথ সম্বন্ধে প্রভাবতীর কথা বার্ত্তা শুনিয়া হেমন্ত সন্ন্যাসী আশ্রমে কৃষ্ণচন্দ্রের কথা আমূল বর্ণনা করিলেন, তখন প্রভাবতীর মনে সেই আহত ব্যক্তির পরিচ্ছদস্থিত পত্রিকা খানি দেখিবার কৌতুহল জন্মিল, হেমন্ত সেই রুধিরাক্ত পত্রিকা খানি বাহির করিয়া যুবতীর হস্তে দিলেন, পত্রিকার লিপিভঙ্গী দেখিয়াই যুবতী সর্ব্বনাশ ভাবিলেন, তাঁহার মস্তকে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন, কি দুর্ঘটনা! পত্রিকা খানি তাঁহার প্রিয় সহচরী তিলোত্তমার লিখিত, জগতের মধ্যে সে যাহাকে ভাল বাসিয়াছিলেন, সেই ভালবাসার ধন দেবঘরের বনে কৃষ্ণ কর্ত্তৃক আহত হইয়াছে। কি করিবেন, কাহাকে বিশেষ সংবাদ জিজ্ঞাসা করিবেন, কেহই ছিল না, কাজেই তাঁহার ভাবনা উপস্থিত হইল, পত্র মধ্যে কৃষ্ণের নাম দেখিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন, সে যে একজন ভয়ানক লোক হইয়া উঠিতেছিল একথা প্রভাবতী প্রায় শুনিয়া আসিয়াছিলেন। যাহা হউক এত দীর্ঘকাল পরে যদি সুখের দিন দেখা দিল; তাহাতেও বিধাতা এমনি বিমুখ যে দেশে গিয়া,

দুজন চিনাশুনা, ছেলে বেলার সঙ্গিনীর সঙ্গে যে মনের কথা কহিয়া দুঃখভার লাঘব করিবেন তাহার উপায় থাকিতেছে না। এখান হইতে এখনও বর্দ্ধমান এক দিনের পথ, পদে পদে যেরূপ বিভীষিকা দেখিতেছেন ইহাতে তাঁহার বোধ হইতেছিল না যে এ পথটুকুও নির্ব্বিঘ্নে উত্তীর্ণ হইয়া যাইবেন।



ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

নিগোনের সরাই।

সে দিন আহারাদি করিয়া হেমন্ত আর প্রভাবতী দুজনে আসিয়া নিগোনের সরায়ে উপস্থিত হইলেন; ঐ স্থান বেশ জায়গা, এ অঞ্চলের মধ্যে একটী গণ্ডগ্রাম, এখানে অনেক লোকের বাস আছে। স্থানটীও বেশ,—চতুর্দ্দিকে প্রান্তর, পথ ঘাট শুষ্ক, কঙ্করময়; বর্ষাকালে সকল স্থান পথিকের সুগম্য বটে। নিগোনে প্রকৃতি দেবী হাস্যমুখী। কৃষকের প্রতি সুপ্রসন্না, এজন্যই সকলে সুখী,—কৃষি প্রধান গ্রাম বলিয়া ইহা একটী বাণিজ্যের আড্ডা, এখানে একটী হাট আছে, সেই খানেই পান্থ জনেরা আসিয়া আহারাদি করিত, রাত্রি যাপন করিবারও যোগ্য স্থান পাইত। তথায় পৌঁছিয়া আমাদিগের যুবক যুবতী দুইটীতে একটী পুষ্করণী তীরে আসিয়া শ্রান্তি দূর করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। তখন বেলা অতি সামান্য ছিল,—গ্রামের কুলমহিলাগণ গা ধুইবার জন্য পিঞ্জর হইতে বাহির

হইয়া পুষ্করিণীঘাটে যাইতেছেন, প্রভাবতীর ন্যায় কামিনী অনেক ভদ্রলোকের অন্তঃপুরেও সুদুর্লভ; এরূপ ললনার সন্ন্যাসিনীবেশ দর্শনে অনেক কুলকামিনী আসিয়া তাহাকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল, তাহার রূপ প্রভায় পুষ্করিণীঘাট আলোকিত হইল, যে শুক্র তারা অমানিশাকে ঈষৎ স্ফূর্ত্তিবতী রাখে কৌমুদিপ্রভায় তাহাকেও দিপ্তিহীন দেখায়, তাই এখানে অন্যান্য সুন্দরী কামিনী থাকিলেও প্রভাবতীর নিকট তাহাদিগকে প্রতিভা শূন্য দেখাইয়াছিল। গৃহস্থাঙ্গনাদিগের সান্ধ্যকৃত্য দূরে গেল, ক্রমে সন্ধ্যা হইল,—দিবাকর হাসিতে হাসিতে অস্তাচল চূড়ায় বসিলেন; পুষ্করিণীর কৃষ্ণাভ সলিল রাশিতে তরঙ্গমালা নাচিয়া নাচিয়া কামিনীগণকে আহ্বান করিতে আরম্ভ করিল, সেরূপ মনোজ্ঞ অভ্যর্থনায় কে শান্ত থাকিতে পারে? সকলেই সাগ্রহে অবগাহন করিল। পুষ্করিণীও কামিনীগণকে পাইয়া নানা ছলে খেলা করিতে লাগিল, কখন সুকোমল উরস, কখন রক্তিম গণ্ডস্থল ধৌত করিয়া দিতে আরম্ভ করিল, কখন বা শ্রুতি পার্শ্বলম্বিত বিরল কেশগুচ্ছ ধরিয়া কৌতুক করিতে লাগিল। তাহারাও ক্রীড়াপর বালকের মত তরঙ্গ রাশিকে লইয়া আদর দিয়া কত রঙ্গে নাচাইয়া, দোলাইয়া আপনাদিগের নিদাঘতপ্ত বরাঙ্গ শীতল করিতে লাগিল।

দিবা শেষ হইয়া রাত্রি আসিতেছে, নিগোন অপরিচিত স্থান, এই সময় আশ্রয় না লইলে, পরে বড় কষ্ট হইতে পারে এই ভাবিয়া পুষ্করিণীঘাট ত্যাগ করিয়া তাঁহারা বাজারে আসিয়া এক পান্থাবাসে আশ্রয় লইলেন, ঘরটি সামান্য রকমের বড় বেশী উচ্চ নয়, দেওয়াল গুলি বেশ পরিষ্কৃত নয়, এজন্য অনেক স্থানেই উচ্চনীচ, কোন স্থলে ছোট ছোট গহ্বর, বাধা পায় না, এজন্য ছোট বড় নানা জাতীয় মাকড়সা নিরীহ কীটশীকার জন্য অনেক গুলি জাল বিস্তার করিয়া ঘরের কোণ গুলি অধিকার করিয়া বসিয়াছে। ঘরের চালটী বড় পরিচ্ছন্ন নয়, তবে রৌদ্র ও শিশির নিবারণে সম্পূর্ণ উপযুক্ত বটে। ঘরের মেজেয় কতক-গুলি আকা, দুই তিনটী আকা লইয়া এক একটী বিভাগ, তাহার উপর দেওয়ালে একটী প্রদীপ রাখিবার ছোট গর্ত্ত, দীপশিখা লাগিয়া সেই গর্ত্ত গুলি কৃষ্ণ বর্ণ হইয়া রহিয়াছে। ঘরে একটী মাত্র দ্বার, দ্বার বন্ধ করিলে বায়ু সঞ্চালনের কোন সুবিধা থাকে না। তাহাতে যে কপাট আছে, কেহ চেষ্টা করিলে বাহির হইতে রুদ্ধ দ্বার অনায়াসে মুক্ত করিতে পারে, রঘুনাথের বিনাশের পর তাহার সর্বভিক্ষাহারী জীবিত আছে, সে যে একবারে প্রতিহিংসা পরিত্যাগ করে নাই, কখন কোন সূত্রে জীবন নষ্ট করিবেই, এ ভয়

হেমন্ত প্রভাবতীর মনে বরাবর জাগরূক আছে, সঙ্গে টাকা নাই যে দস্যু ভয় থাকিবে, তবে প্রাণের ভয়টা বড় প্রবল ছিল; থাকিলে কি হয়, এখানে পান্থদিগের থাকিবার জন্য এ অপেক্ষা ভাল ঘর ছিল না, কাজেই স্বীকৃত হইতে হইল। যাহা হউক গৃহ প্রবিষ্ট হইয়া উভয়ে একটু বিশ্রাম লইলেন, ক্রমে আহারাদির উদ্যোগ হইতে লাগিল। রাত্রি একটু অধিক হইলে জনতা হ্রাস হইতে আরম্ভ হইল,—পূর্ব্বের মত আর বড় গোলমাল রহিল না।

প্রভাবতী রন্ধন কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন, হেমন্ত সমস্ত উদ্যোগাদি করিয়া শেষে একত্রে বসিয়া নানা কথা কহিতে লাগিলেন,—কন্যা শ্বশুরালয়ে থাকিলে যেরূপ জন্ম ভূমি দর্শনোৎসুক হয়, প্রভাবতী ততোধিক হইয়াছিলেন, এক মুহূর্ত্তের জন্য অন্য চিন্তা ছিল না, কেবল সেই পিতৃভবন, সেই গোলা পুষ্করিণী, সেই পিতামাতার ভাল বাসা ইত্যাদি,—এসব যত মনে হইতে লাগিল ততই আগ্রহশিখা হৃদয়ে জ্বলিতে আরম্ভ করিল, প্রতিবারেই মনে হইতে লাগিল আলাটী গ্রাম যদি কোন দৈব সুবিধায় নিকটবর্ত্তী হয় তাহা হইলে অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইতে পারেন, কখন বা খেচরদিগের আকাশ পথে স্বেচ্ছা ভ্রমণের ঈর্ষা মনে উদয় হইতেছিল,—ঐ সকল ভিন্ন আর একটা গুরুতর ভাবনা

ছিল, পাঠক! শীঘ্রই সে কথা জানিতে পারিবেন।
নিকটে হেমন্ত উপবিষ্ট,—প্রভাবতী যে কোন চিন্তায়
গাঢ় নিবিষ্ট তা তাঁহার ভাব ভঙ্গীতেই বিশিষ্টরূপে
প্রকাশ পাইতেছিল। প্রভাবতী রন্ধন করিতেছিলেন,
যখন অগ্নি প্রজ্জলিত, এমনি মনের ভ্রমে হয় ত তখন
তাহাতে আরও কাষ্ঠ দিয়া জ্বালাইতেছিলেন, যখন
অগ্নি নির্ব্বাণ তখন হয়ত নিস্তব্ধ,—কখন অনুচ্ছ্বাসিত
সূপ রন্ধনদণ্ডে মর্দ্দন করিতেছিলেন, কখন বা বৃদ্ধা-
ঙ্গুষ্ঠে ক্ষিতি খনন করিতেই ব্যস্ত, মনে নাই যে রন্ধনে
বিলম্ব হইলে ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করিতে হইবে। হেমন্ত
কৌতুক করিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন "এ ত দেব-
ঘরের অরণ্য বা কাপালিকাশ্রম নহে, তবে এতাধিক
চিন্তার কারণ কি?"

প্রভা। সত্য বটে মানবমন কিছুতেই সন্তুষ্ট নহে;
একটা অভাব পূর্ণ না হইতে হইতেই নূতন অভাবের
কল্পনা উপস্থিত হয়, দুঃখের ক্রমোন্নতির এই একটী
প্রধান কারণ।

হেম। এখন ত অন্য অভাব কিছু দেখিতেছি না।

প্রভা। বনে থাকিতে মনে করিতাম কোন
উপায়ে দুরাত্মাদিগের হাত হইতে পলাইতে পারিলেই
স্বর্গসুখ ভোগ করি, এখন মনে হইতেছে, কত সত্বর
জন্মভূমি, পিতা, মাতা ও সঙ্গিনীগণকে দেখি। বিশেষ

আপনার সহিত পরিচিত হইবার পূর্ব্বে দুইটী আশা বলবতী ছিল, একটী ত সফলা হইয়াছে অপরটী মনেই শুকাইয়া যাইতেছে, তাহা প্রকাশ যোগ্য নহে।

হেম। আপনার জন্মভূমির এখনও অর্দ্ধেক পথ আছে, ইহার মধ্যে কোন্ আশার ফল প্রাপ্ত হইলেন, আর কোন্টীই বা বিফল দেখিতেছেন?

প্রভা। যখন দুরাত্মাদিগের নিকট হইতে পলা-ইয়া লোকালয়ে প্রবেশ করিয়াছি, তখন আজি হউক, কালি হউক বা দশদিন পরেই হউক, জন্মভূমি দেখিতে পাইব, পিতা মাতার সাক্ষাৎ লাভ করিব। এইটী প্রায় সফলা আর আপনার বিবরণ আনুপূর্ব্বিক শুনিয়া অপরটী একবারে নির্ম্মূলপ্রায় হইয়াছে।

হেম। কি এমন আশা এই অল্প সময় মধ্যেই নষ্ট হইল, বলিবার কোন বাধা আছে কি?

প্রভা। মনের এমন কি কথা আপনাকে গোপ-নীয় আছে, যে প্রকাশ করিব না। তবে দাসীর প্রার্থনা পূর্ণ করিতে না পারিলে পাছে আপনি অনুতপ্ত হন তাহাতেই কুণ্ঠিত হইতেছি।

হেম। কুণ্ঠিত হইবার কোন কারণই নাই, যখন সাক্ষাৎকালে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি প্রাণ দিয়াও আপনার প্রার্থনা পূর্ণ করিব তখন সঙ্কোচ করিতেছেন কেন?

প্রভা। যে জন্য গৃহত্যাগী হইয়াছেন, সংসারসুখ

ভোগে জলাঞ্জলি দিয়া চির-ভালবাসাকে ত্যাগ করিয়াছেন, তখন এই অচিরপরিচিতা কামিনীর সে আশা করা আকাশ-কুসুম কল্পনামাত্র। পিতৃভবন পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে যে ভাবনা ছিল, তাহার পরে অপহৃতা অবরুদ্ধা অবস্থায় সে আশা একবারে ছাড়িয়া দিয়া কেবল পরিত্রাণ চিন্তা করিতাম,—আপনার দর্শনে মনে করিয়াছিলাম নিশীথের অন্ধকারের পর মধ্যাহ্ন তপনের দীপ্তালোক বুঝি অকস্মাৎ এককালে আসিয়া জুটিল। মন স্বভাবের প্রতিকূল কল্পনার সম্ভবাসম্ভব বিবেচনা করিতে পারিল না। এখন শেষ চিন্তাই অতিশয় বলবতী,—কি করি অন্যান্যুপায়। তাই এত ভাবনা ভাবিতেছি।

হেম। সে ভাবনা বৃথা, যাহা ঘটিবার নহে, যখন তাহা ঘটিয়া গিয়াছে তখন যে সামান্য কার্য্যে আপনার মনঃক্ষোভ জন্মিবে ইহা নিতান্ত অসম্ভব। অসাধ্য সাধনে যখন মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ হইল তখন কন্দর্প নিধনে বিলম্বের শঙ্কা বৃথা। শেষ কথায় প্রভাবতীর মৃতকল্পা আশালতা পুনঃজীবিত হইল? লজ্জায় মৌনবতী হইলেন, মনে ভাবিলেন মন্মথ পীড়নে লোকে ভালমন্দ জ্ঞানশূন্য হইয়া, এমন কি উন্মত্ত হইয়া পড়ে; কি বলিতে কি বলিলাম? বলিবার সময় এ লজ্জা ছিল না। বোধ হয় উনি আমার মনের ভাব স্পষ্ট

জানিতে পারেন না। আমি যে এত অধীর, বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন কি না সন্দেহ। যদি বুঝিয়া থাকেন তবে কি লজ্জার কথা, যাহা হউক বলিয়া কি মন্দ কর্ম্মই করিয়াছি। বোধ হয় এক রকম ভালই হইয়াছে। রাত্রি অধিক হইল, দোকানদার, গ্রামবাসী অধিকাংশ লোকেই নিদ্রিত হইল, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, মন্দ মন্দ বৃষ্টি পড়িতেছে, কৃষ্ণ মেঘের কোলে থাকিয়া থাকিয়া এক একবার চপলা খেলা করিতেছে, বিদ্যুৎ আলোক ভিন্ন কোলের মানুষ দৃষ্ট হইবার নহে। বৃক্ষ সকল খদ্যোৎমালায় অঙ্গ সাজাইয়াছে, তাহাদের মধ্যে এক একটা থাকিয়া থাকিয়া নিভিতেছে, জ্বলিতেছে, উড়িতেছে, আবার বৃক্ষপত্রে বসিতেছে, এই রূপে কত অপূর্ব্ব খেলা খেলিতেছে, ভাবুক পাঠকের ভ্রম হয় বুঝি তরুঅঙ্গে মণিময় হার ঝলমল করিতেছে। এ নিস্তব্ধ সময়ে গৃহস্থ সকলেই আপন আপন গৃহে আশ্রয় লইয়াছে, কেবল তস্কর প্রাচ্ছন্নভাবে থাকিয়া মৃদু পাদক্ষেপে গৃহস্থের নিদ্রা বা অসাবধানতার অপেক্ষা করিতেছে, উপরে বৃষ্টি পড়িতেছে, তাহা গ্রাহ্য নাই, যেরূপে হউক ইষ্ট সিদ্ধির প্রয়োজন, এ সময় সর্পাঘাত হইলেও উঃ! করিবার উপায় নাই; আর লম্পটেরা দিবসের ইঙ্গিতমতে বার-প্রণয়িনীর নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইবার জন্য কর্দ্দমিত পথে পা টিপিয়া টিপিয়া চলিতেছে।

হেমন্ত আহার সমাপন করিলেন, গৃহবহির্গত হইতেছেন এমন সময় গৃহের অনতিদূরে একটী মনুষ্যমূর্ত্তি তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল, দেখিবামাত্র বিদ্যুতের ন্যায় অদৃশ্য হইল, তাহার পর গৃহের চারিদিক খুজিলেন, দেখিতে পাইলেন না। প্রভাবতী স্ত্রীলোক, সহজে ভীতা একথা প্রকাশ করিলে পাছে সমস্ত রাত্রি তাঁহার নিদ্রা না হয়, তাহা হইলে প্রভাবতীর ক্লেশ, সেই ক্লেশে হেমন্তের নিজেরও যথেষ্ট কষ্ট, এজন্য তাঁহাকে কোন কথা প্রকাশ করিলেন না,—শয়ন করিলেন। সমস্ত দিনের পরিশ্রম, শয়নমাত্র যুবতীচক্ষে নিদ্রা আসিয়া অধিকার করিল। শয়ন অবধি হেমন্তের মনে নানা চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইল, একটা অন্যটার প্রতিবাদ করিল, আর একটা নূতন আসিল, অন্য একটা তাহার প্রতিবাদ করিল, এইরূপে রাশি রাশি চিন্তা, নানা গোলোযোগে মনকে অস্থির করিয়া তুলিল শেষে আবার আপনাপনিই ক্ষণেক পরে অন্তর্হিত হইল। এই উৎপাতে অনেকক্ষণ নিদ্রা হইল না। রাত্রি দুইপ্রহর অতীত, প্রকৃতি শান্তমূর্ত্তি, চৌকীদারেরা একে একে গ্রামের প্রজাদিগকে জাগ্রত করিয়া বাজারে প্রবিষ্ট হইয়া ক্রমে সকলকেই সচেতন করিল, মুসলমান রাজ্যে পল্লীগ্রামের চৌকীদার এতদূর করিল এই যথেষ্ট। এই কার্য্য করিয়া তাহারা সকলে আপন

আপন স্থানে গমন করিল, ইহার পর প্রজাদিগের ধন প্রাণ তাহাদিগের আপন আপন সতর্কতায় রহিল, চৌকীদার না জাগিযাও সমস্ত রাত্রি জাগ্রত, খুন হউক, ডাকাইতি হউক, সহস্র ডাকেও রাত্রি মধ্যে চৌকীদারের পুন দর্শন ঘটিবে না। হেমন্ত পল্লীগ্রামের রীতিনীতি সমস্ত জানিতেন, কি করিলে কি হইবে বেশ বুঝিতেন, এজন্য ভাবিলেন ইহার পর আর নিদ্রা আসিলেও যত্ন করিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে। যে রূপে হউক নিদ্রাকে পরাভূত করা আবশ্যক, তাই এ, ও, তা, আপনার বাড়ী, ঘর, পিতা মাতা, পুষ্করণী, নদী, গৃহকার্য্য একে একে সকলি ভাবিতে লাগিলেন। সকলি নদীর স্রোতের ন্যায় চলিয়া গেল,—শেষে কুসুমের ভালবাসা আসিয়া মনে দীপশিখা জ্বালিয়া দিল, বক্ষঃ-স্থল ভার হইল, জোরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস বহিল,—অপাঙ্গে একটী অশ্রুবিন্দু উঠিয়া কর্ণমূলে পতিত হইল, এখন মাতৃপিতৃহীন অসহায় কুসুম কোথায় কি করিতেছে, এক্ষণে সে জীবিতা কি মৃতা, কি উন্মত্তা, তত আদরের, তত যত্নের কুসুম,—কত কষ্টই ভুগিতেছে। কিন্তু এক দণ্ডের জন্যও তাঁহার মনে এ চিন্তা হয় না যে তাহার তত রূপ তেমন সরল স্বভাব, এতদিন কেহ না কেহ তাহাকে বিবাহ করিয়াছে। তিনি জানিতেন হেমন্ত নাম,' হেমন্ত রূপ ধ্যান করিতে করিতে অতি

কষ্টে তাহার প্রাণপাখী যদি দেহপিঞ্জর ভগ্ন করিয়া বাহির হয় তবু সে অন্যের ভালবাসা প্রার্থনা করিবে না, অন্যের প্রণয়প্রার্থিনী হইলে, এত দুঃখের কারণ ছিল না, হেমন্তকেও দেশত্যাগী হইয়া নানাস্থানী হইতে হইত না। কুসুমের অন্য আশা, অন্য আশ্রয় নাই, কোথায় ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে,—তাই হেমন্তের এত চিন্তা।



সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

—*—

নূতন বিপদ।

রাত্রি যত অধিক হইতে লাগিল, হেমন্তের চক্ষে নিদ্রার তত জোর প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু কোনরূপেই তাহার চক্ষুকে পরাভূত করিতে পারিল না, এক একবার চক্ষু মুদিত হইয়া আইসে কিন্তু দুই হস্ত ঘর্ষণের তাপে নিদ্রাকর্ষণ দূর করিতেছিলেন, আবার চক্ষু মুদিত হইতেছিল, আবার পূর্ব্বোক্ত উপায়ে তাহা নিবারণ করিতেছিলেন, আর সামান্য শব্দ হইলেই তাহাকে বিহঙ্গমদিগের কলধ্বনি বোধে উষাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন,—অকস্মাৎ গৃহমধ্যে যেন দীপালোক জ্বলিয়া উঠিল, হেমন্তের চক্ষু ঝল্সিয়া গেল, রুদ্ধদ্বারগৃহে কিরূপে দিবসের আলোক আসিল তিনি ইহার কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না, গৃহ মধ্যে অপর ব্যক্তিকেও দেখিতে পান না, কেবল পৃথক শয্যার প্রভাবতী নিদ্রিতা, দেখিতে দেখিতে অগ্নিরাশি

মস্তকের উপর উঠিল, গৃহের চাল জ্বলিতেছে তাঁহার অনুমান হইল,—কি করেন নিদ্রিতা যুবতীকে জাগ্রত করিবার অবসর পাইলেন না, তাঁহাকে কক্ষে লইলেন, বহির্দ্বারের অর্গলচ্যুত করিয়া দেখেন বাহির হইতে দ্বার রুদ্ধ, উপর হইতে অগ্নিস্তূপ পতিত হইতেছে. দ্বার ভগ্ন করিতে হইলে দুই হস্তের বল আবশ্যক, কিন্তু দুই হস্ত প্রয়োগ করিলে যুবতীর মায়া ত্যাগ করিতে হয়; হেমন্তের উভয় শঙ্কট! যতক্ষণ পাঠককে এই অবস্থা জানাইতেছি সেই অবসরে যুবতী অঙ্গে অগ্নিতাপ লাগিলে, তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, প্রাণের ভয়ে তিনি হেমন্তকে জড়িয়া ধরিলেন, তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল, প্রভাবতীকে পশ্চাতে রাখিয়া হেমন্ত দুই হস্তে অর্গল ধরিয়া দ্বার ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন, প্রভাবতী ছাড়েন না প্রাণপণে বাহুযুগলে হেমন্তকে ধরিয়া রহিয়াছেন, হেমন্ত অতি সাবধানে যুবতীকে সেই দাহ্যমান গৃহ হইতে বাঁচাইয়া বাহিরে আনিলেন, তখন তিনি জ্ঞানশূন্য, অনেক যত্নে, অনেক বাতাস করিতে করিতে যুবতী চক্ষু মিলিয়া দেখিলেন, সম্মুখে হেমন্তকে দেখিয়া মনে একটু আশা জন্মিল, যে ভয়ে মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন এখন তাহার সে ভয় নাই।

গৃহ নির্ব্বাণ না হইতে হইতেই রাত্রি প্রভাত হইল, উষার হাসিতে পূর্ব্বদিক ফরসা হইয়া আসিল, পক্ষী-

দের মধ্যে যাহারা দিবাচর, পূর্ব্বদিকে আলোক দেখিয়া উচ্চকলরব করিয়া উঠিল, তাহাদের মধ্যে কোকিল আর পাপিয়া নব্য বাবুর মত বড় আমোদ প্রিয়, তাহারা অবিরাম চীৎকার করিতে লাগিল, দয়েল অতি চঞ্চলমতি দশ পনর বছরের বাধোয়া ছেলের মত তাই নাচিয়া নাচিয়া শিশ টানিতে আরম্ভ করিল। শুকতারা মিট মিট করিতে লাগিল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রগুলি একবারে নীলগগণের কোলে মিশাইয়া গেল। পূর্ব্বদিকের সহাস্যমুখ দেখিয়া সুবর্ণ কিরণে সূর্য্য আসিয়া দেখা দিল, দিবসের কোলে ক্রীড়া পরায়ণা বালিকার মত পৃথিবী হাসিতে লাগিল।

সমস্ত রাত্রি জাগরণ, দিবসে অন্য কোন নিভৃতে আশ্রয় লইয়া হেমন্ত নিদ্রার ক্ষতিপূরণ ইচ্ছা করিতেছেন এমন সময় দোকানদার আসিয়া হেমন্তকে ধরিল, তাহাদের অবস্থিতি কালে যখন গৃহ দগ্ধ হইল তখন গৃহের মূল্য তাঁহাদিগের দেয়। "জোর যার মুলুক তার" হেমন্ত লেখা পড়া জানিতেন, তাঁহার ন্যায় অন্যায় জ্ঞান ছিল, প্রতিবাসীরা দোকানদারের পক্ষ হইল, সকলেই হেমন্তকে অপরাধী নিশ্চয় করিল, গৃহের সমস্ত ব্যয় তাঁহাকে দিতে হইবে। যেখানে এরূপ অত্যাচার তখন যে উচিতাধিক অর্থ দাওয়া করা হইয়াছিল একথা বলা বাহুল্য। এ সকল দুর্ব্বিপাক

প্রভাবতীর ললাটলিপির ফল, তাহার গ্রহগণ এখনও অনুকূলভাব ধারণ করেন নাই, এখনও রাশিচক্রের পাকে প্রভাবতীর অদৃষ্ট ঘুরিতেছে। যুবতী স্বেচ্ছায় পিত্রালয় ছাড়িয়া আইসেন নাই যে, সঙ্গে কিছু লইয়া আসিয়াছিলেন, তায় বহুদিন সন্ন্যাসাশ্রমে প্রতিপালিত, হেমন্ত মনের বিরাগে সংসার ছাড়িয়া আসিয়াছেন সুতরাং সংসারে কেনই বা তাঁর যত্ন থাকিবে? উভয়ের হস্তে সম্বলস্বরূপ এক কপর্দ্দকও ছিল না, কি করেন তেমন লোকবলও নাই যে সেই স্থান হইতে পলায়ন করেন। কাজেই তাঁহাদিগকে দশচক্রে ভগবানের ন্যায় দুষ্টদিগের ক্রীড়নক হইতে হইয়াছিল। দ্যুগারা তাঁহাদের উভয়কে লইয়া সেখানকার ফাঁড়িদারের নিকটে দিল, পল্লীগ্রামে সেকালে ফাঁড়িদারেরাই শান্তিরক্ষক ছিল, এই সময়ে সে স্থানে যে ফাঁড়িদার ছিল তাহার নাম রমজান আলী, সে জাতিতে মুসলমান, কিছু কর্কশ স্বভাবের লোক; হেমন্তও প্রভাবতীকে ভদ্রলোক বিবেচনায় দশটাকা লাভের আশা করিল; কোনমতে ছাড়িয়া দিতে চাহিল না. শেষ পর্য্যন্ত রমজানের ইচ্ছা, হেমন্তকে ভয় মৈত্রে যদি বিদায় করিতে পারে তাহা হইলে প্রভাবতীকে হস্তগত করিয়া রাখে, নিতান্ত পক্ষে নিজের না হয়, নবাব সাহেবকে মিলাইয়া দিলে পদোন্নতির

অপ্রতুল হইবে না। হেমন্ত মিষ্টবচনে কহিলেন ;—"ফাঁড়িদার সাহেব! আমরা নিরপরাধী, দুষ্ট লোকের প্রবর্ত্তনায় আমাদিগকে অবরুদ্ধ রাখিলে আপনার কোন লাভ নাই, দয়া করিয়া ছাড়িয়া দিলে আপনার প্রতি ঈশ্বর সুপ্রসন্ন হইবেন, আপনি ধর্ম্মাবতার, আপনি মনে করিলে সকলই করিতে পারেন, এখন আমরা হুজুরের দয়ার পাত্র, কষ্ট দেন কোন হাত নাই।"

হেমন্ত কুমারের এই সকল আর্ত্তবচনে তাহার মনে দয়ার লেশমাত্র হইল না, বরং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্রুদ্ধ হইলেন এবং অনুচর চৌকীদারদিগকে অনুমতি করিলেন, "তামাকু আন্‌রে" ঘাড় হেঁট করিয়া ফাঁড়িদার সাহেব ডানি হস্তে শ্মশ্রু বিন্যাস করিতে লাগিলেন, আপনাপনি মনে করিতেছিলেন, যে পায়া পাওয়া গিয়াছে ইহাতে কত ভদ্র লোক অনুগত থাকে, সকলে ভয় করে, মনে করিলে তাহাদিগকে কত কষ্ট দিতে পারি, এ ব্রাহ্মণ যে আমাকে ধর্ম্মাবতার বলিতেছে, তা সাক্ষাৎ ধর্ম্মাবতারই বটে, নামে মাত্র দারোগা সাহেবদের অধীন, বছরের মধ্যে প্রায় তিনশ ষাট দিন মফঃস্বলে বসিয়া কেরামত জাহির করিতেছি,—কাহারও এতোজারি করিতে হয় না, কেবল দুএক দিন দারোগা সাহেব আসিলে ছুটাছুটি করিতে হয়, তাও অতি অল্পক্ষণের জন্য। ফাঁড়িদারের ভাবভঙ্গী দেখিয়া

চৌকীদারেরাও হাত পা নাড়িতেছে, এ ও তা সকার বকার দুটো দশটা কথা বলিতেছে,ব্রাহ্মণকুমার জানেন ফাঁড়িদার মনে করিলে আপাততঃ অনেক কষ্ট দিতে পারে, এবং যেরূপ কঠোর লোক তাহাতে অব্যাহতি পাইবার সহজ উপায় নাই। সুধীর হেমন্ত পুনরায় মৃদুমধুর বচনে ফাড়িদার সাহেবের নিকট বিনয় করিতে লাগিলেন, তখন প্রভাবতীর দিকে সাহেবের দৃষ্টি পড়িয়াছিল. জগতে এমত পাষণ্ড লোক অতি অল্প আছে, যে প্রভাবতীর রূপ দেখিলে একদণ্ড চাহিয়া না দেখে, এরূপ কর্কশ লোক প্রায় নাই যে এ মূর্ত্তির এক গাছি কেশ ছিন্ন হইলে দুঃখ বোধ না করে। প্রভাবতীর মুখে সরলতা, অমায়িকতা দেখিয়া ফাঁড়িদারের মনে বসন্তের মৃদু মারুতের ন্যায় একটু দয়ার সঞ্চার হইল, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রভাবতীর রূপ লাবণ্যে লোভ জন্মিল। এ পৃথিবীতে যে গৃহী. সংসারী যাহার মাথায় চাবি চালের ভার আছে, রোগে সেবা করিতে, বিপদে সান্তনাদিতে, সৌভাগ্যে সুখী করিতে প্রত্যেকেরই হৃদয়ে এক একটী শান্তিমতিমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। সে মূর্ত্তি অন্তঃকরণের শোভা, মনের আনন্দদায়িনী যাহার দর্শনে ঘোর বিপদকালেও মনুষ্যজীবনে সুখের বিদ্যুৎ প্রকাশ পায়। রমজান আলীও মনুষ্য, গৃহীও বটে, না হইলে সামান্য বেতনের জন্য স্বাধীনতা

বিক্রয় করিয়াছে কেন, সুতরাং সেও যে সংসারের সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত কেমন করিয়া বলিব, বিপদে মনের কথা বলিয়া দুঃখের অংশ দিতে, সুখের সময় আমোদ করিতে, দেশে, বিদেশে, যেখানে যখন থাকুক মনে চিন্তা করিতে এই পৃথিবীতে তাহারও ভালবাসার ধন ছিল। ভবের বাজারে যে প্রকৃত প্রণয়বাউল, সে কখন আপনাবটীকে পনর আনা করে না। পাঠক! যদি প্রকৃত প্রেমিক হও, প্রণয়িনীর প্রণয়-হার যত্ন করিয়া যদি গলে ধারণ করিয়া থাক, একবার হৃদয়-দর্পণে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, কোন্ মূর্ত্তি তাহাতে প্রতিফলিত হইয়া তোমার চিত্ত আকর্ষণ করে, দেখিবে। রমজান আলী কেমন লোক ছিল আমরা জানি না, গৃহিণীর রূপ গুণের কতদূর পক্ষপাতী ছিল বলিতে পারি না, তবে এই বলিতে পারি, যে প্রভাবতীর রূপে তাহার লোভ জন্মিয়াছিল, পাঠক মনে করিতে পারেন, প্রভাবতী নিরলঙ্কারা, মলিনদেহা, রুক্ষকেশা, চিরপরাধীনা, কিসেই এত ভাল যে দেওঘরের বনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া অবধি আমরা তাঁহার দেহকান্তির পক্ষপাতী হইয়া আসিতেছি। সত্য বটে যুবতীর অঙ্গে অলঙ্কার ছিল না, তৈলাভাবে শ্রীহীন বেশ অর্দ্ধ উলঙ্গিনী, কিন্তু মনে করুন আপনি কোন ধুমধামের মেলা দেখিতে গিয়াছেন, সেখানে দিব্য একটী

মোম নির্ম্মিত সুন্দর গোলাপ বিক্রয় জন্য আছে, দেখিলেন, পাপ্ড়ীগুলি সুবিন্যস্ত, সুন্দরবর্ণ, জ্যোতিঃবিশিষ্ট দেখিয়া মন ভুলিয়া গেল, আগ্রহে হস্তে লইলেন, ভ্রমে পড়িয়া আঘ্রাণ লইতে গেলেন, সৌরভে মন নাচিয়া উঠিল,—যেহেতু একটু আতর মাখান। অধিক মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়া বাটীতে আনিলেন, আনিবার সময় বহির্দ্বারের বাগানে যে গোলাপ ফুটিয়া আছে তাহার দিকে একবারের জন্য তাকাইলেন না,—বৈটকখানায় আনিয়া যত্ন করিয়া রাখিয়া দিলেন, ঠকিয়া গেলেন, বাগানের গোলাপ ঘরে থাকিলে ঘর আমোদিত করে, কোমলতার মাধুর্য্যে প্রাণ কাড়িয়া লয়, বাজারের গোলাপে সে সকল কিছুই নাই, কেবল দৃশ্যশোভা। চাক্‌চিক্যে, বাহ্যিক আড়ম্বরে বাগানের গোলাপ বাজারের গোলাপের কাছে হারি মানে, আচ্ছা! ভাল বাসিবেন কাহাকে? বাগানের গোলাপ যে কারণে আদরের জিনিস আমাদের প্রভাবতীও সেই কারণে দর্শকের মনোহারিণী।

রমজান আলী মধ্যে মধ্যে এক একবার কুটীল দৃষ্টিতে প্রভাবতীর প্রতি লক্ষ্য করিতেছিল, মনে কল্পনা এই যে প্রভাবতীকে হাতে আনিতে পারিলে নিজের অনেক মঙ্গলের সম্ভাবনা, আপনার দুরভিসন্ধি সিদ্ধ হইতে ব্যাঘাত থাকিলেও নবাব সাহেবকে উপহার

দিয়া দারোগাগিরি পাইবার আশা আছে, অন্ততঃ জমাদারী লাভের সংশয় নাই;—এজন্য ফাঁড়িদার সাহেবের ইচ্ছা কোন কৌশলে হেমন্তকে পৃথক করিয়া দিয়া প্রভাবতীকে হস্তগত করে,—ইহারই চেষ্টায় রমজান আলী হেমন্তকে অনেক কষ্ট দিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। হেমন্ত নিতান্ত বুদ্ধিহীন ছিলেন না, বুঝিয়া লইলেন যে বুঝিবা প্রভাবতীর অদৃষ্ট বিপদ উচ্ছ্বাসে আবার ভাসিয়া যায়,—যুবতীর নূতন বিপদ উপস্থিত।

যখন সমস্ত গ্রামের লোক, শান্তিরক্ষক ফাঁড়িদার সকলেই তাঁহাদিগের বিপক্ষ তখন প্রভাবতীকে লইয়া প্রস্থান করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। হেমন্তের মনে ভরসা ছিল যে বলে যাহা সম্পন্ন না হয় কলে কৌশলে তাহা সিদ্ধ হইবার আশ্চর্য্য নাই, যাহা হউক কোন কার্য্যের পরিণাম না দেখিয়া নিরুদ্যম হওয়া উচিত নহে। হেমন্ত যখন তত বিভীষিকা অতিক্রম করিয়া দুরন্ত সন্ন্যাসীদিগের আশ্রম হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছেন তখন তাঁহার আগ্রহ জন্মিল কিরূপে কোথায় প্রভাবতীর দোদুল্যমান অদৃষ্টপরিদোলক স্থগিত হয়।

হেমন্ত মুসলমান রাজ্যের লোক, মুসলমানদিগের রাজ্যশাসন-প্রণালী বেশ জানিতেন, কাজীর বিচারের কথা অনেকবার শুনিয়াছিলেন. কোথাও অন্যায় বিচা-

বের কথা শুনিলে বিদ্রুপচ্ছলে বন্ধুদিগের সহিত পরিহাস করিতেন সুতরাং এরূপ অন্যায় হুকুমে আশ্চর্য্য হইলেন না। কিন্তু মনে বিরক্তির সহিত একটু দুঃখ জন্মিল; কি করেন প্রতিবিধানের কোন উপায় ছিল না।

সহজ কথায় ইষ্ট সিদ্ধির ব্যাঘাত জানিয়া রমজান আলী ক্রমে আমাদিগের নব যুবক যুবতীর প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিল, চৌকীদারদিগকে হুকুম হইল; তাঁহাদিগকে অবরুদ্ধ রাখা হয়। প্রভাবতীর জন্য হেমন্তকে কারাগার দর্শন করিতে হইতেছে, কি করেন তিনি তখন অনন্যোপায,—উপস্থিত বিপদে, অধীর না হইয়া দুঃখের কঠোর কর চুম্বন করিলেন। ফাঁড়িদার সাহেব সহজ লোক নয় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এখন শীকার মুখে পাইয়া তাহা লইয়া নানা রকমে খেলা করিতে লাগিল। আদেশ হইল, দুজনকে পৃথক ঘরে রাখিয়া দাও, নবাব বাহাদুর শীঘ্রই বর্দ্ধমান আসিবেন, এখানে আসিয়া এক দিন ছাউনি করিবেন, সেই সময় বিচার হইবে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

আবদ্ধাবস্থা।

নিগোন নগর নহে, পল্লীগ্রামের মধ্যে একটু ভাল, সুতরাং এখানে রীতিমত কারাগার নাই; যে দুইটী ঘরে প্রভাবতী এবং হেমন্ত অবরুদ্ধ, সে দুইটী ঘর সামান্য দোকান, দ্বারে দুই জন চৌকীদার প্রহরী তাহারা অতিশয় নীচ প্রকৃতি, হেমন্ত প্রভাবতীর প্রতি যে অসদ্ব্যবহার করিয়াছিল এ কথা বলা বাহুল্য। প্রভাবতী সুখের কপোতিনী,—বালিকা কাল হইতে অতি যত্নে প্রতিপালিতা, তাঁহাকে কখন দুঃখের বিকৃত মুখভঙ্গী দেখিতে হয় নাই। সুখের পরে দুঃখ কিছু অধিক কষ্ট দায়ক বোধ হয়, প্রভাবতীর শৈশবাবস্থা অতি সুখের ছিল, তাহার পর অরণ্যবাস অতীব যন্ত্রণাদায়ক, বহু দিন সহবাসে দুঃখের সহিত তাঁহার একটু আনুরক্তি জন্মিয়াছিল, তখন সে অবস্থা আর তত কঠোর বোধ হইত না, হেমন্তের শুভ দর্শনে প্রভা-

বতীব পূর্ব্ব যাতনা নবীভূত হইয়াছিল, অত্যল্প দিনে পবেই ভাগ্যদেবীব মধুব হাসিতে তাঁহার যত দুঃখ দূবে গেল, শৈশবাবধি নিববচ্ছিন্ন সুখভোগ অপেক্ষা এই অবস্থা-বিপর্য্যয়ে আগ্রহাতিশয় সহ সুখাস্বাদে অধিক তৃপ্তি জন্মিল,—অবিলম্বেই আবাব শরৎকালীন আকাশেব ন্যায় প্রভাবতীব অদৃষ্ট মলিন ভাব ধারণ কবিল,—প্রভাবতীব হারাণ ধন ভোগে আসিল না; কাজেই অধিকতব মনস্তাপ পাইলেন, অকুল নিরাশা সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন, দুঃখের ঘোর তমসাবৃতা রজনীতে যে আশা মনুষ্যদিগকে সুখরবির সুন্দব হাসি অদূরে প্রত্যক্ষ সুপ্রকাশিত দেখায় আজি সেই কৃত্রিম চারুহাসিনী কল্পনাময়ী আশা একবারের জন্যও দেখা দিল না। একে প্রভাবতী স্ত্রীলোক তায় প্রবীণা পক্কধীমতী নহেন, পর্য্যায়ক্রমে দুঃখভোগে তাঁহাব চিত্ত বিকৃত হইয়া উঠিল। এখন কি করা কর্ত্তব্য প্রভাবতীর বুদ্ধিতে তাহা জুটিয়া উঠিল না,—

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল আড়া।

কোথা হে করুণাময় বিপদ তারণ,
বিনা দোষে বাঁধে দেখ দুরন্ত যবন,
তুমি সূর্য্য তুমি সোম, তবরূপ ত্রিভুবন,
তুমি বায়ু হুতাশন, তুমি জীবেব জীবন।

কিবা বিপিন বিজন, কিম্বা নৃপতি সদন,
সর্ব্বস্থানে সর্ব্বক্ষণ, করিতেছ বিচরণ।
কবি মিনতি তোমারে, আছ এই কারাগারে,
অনাথিনী কামিনীরে, রাখ ব্রহ্মসনাতন ।।

প্রভাবতী অপেক্ষা হেমন্ত কুমারের দুঃখ অতি কঠোর হইয়াছিল, প্রভাবতী রাজকন্যা সুখের বিহঙ্গিনী এতাধিক কাল পরাধীনতা শৃঙ্খলে অবরুদ্ধ থাকিয়া দুঃখের সহিত একরূপ বেশ বন্ধুতা করিয়াছিলেন। দুঃখ ভোগে প্রভাবতী হেমন্ত অপেক্ষা প্রবীণা এজন্য এ অবস্থায় প্রভাবতী এককালে অধীরা হইলেন না, তবে তাঁহার আন্তরিক কষ্ট যে হেমন্তকুমারের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ছিল না, আমরা বোধ করি এ অবস্থায় যদি প্রভাবতী হেমন্তকুমারের প্রসন্ন-মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেন তাহা হইলে এ কষ্ট তাঁহার অতি সামান্য বলিয়া বোধ হইত; উভয়ে অনেক বিনয় করিলেন রমজান আলীর বধির কর্ণ কোনমতে তাহা শুনিতে পাইল না। শুনিলে ফাঁড়িদারের বাসনা পূর্ণ হইবার অনেক অন্তরায় ছিল। হেমন্তকুমার সঙ্গতিপন্ন ব্রাহ্মণের ঘরের ছেলে, কখনও দুঃখের মুখ দেখেন না প্রভাবতীর প্রণয়ে মজিয়া হেমন্তের এত দুর্দ্দশা,—দেখিলে অনুমান হয় কেশরী ব্যাধ জালে জড়িত। কি করেন, তিনি প্রভাবতীর মায়া

কখন ত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। যতই কেন কষ্ট হউক না প্রভাবতীকে ছাড়িয়া দিলে তাঁহার কাপুরুষতার, অধার্ম্মিকতার পরাকাষ্ঠা প্রকাশ পাইবে. হেমন্ত ধর্ম্মভীরু কোনমতে এ যুক্তি তাঁহার মনে স্থান পাইল না। কিন্তু কি উপায়ে যে নিষ্কৃতি লাভ করেন তাহারও কোন উপায় পাইতেছেন না, এজন্য সময়ের মুখাপেক্ষা করিয়া কারাগারেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, তাঁহারা সেই অন্ধকারময় গৃহে সমস্ত সময় কাটাইলেন ঊষার হাসি, প্রদোষের মলিনতা তাঁহাদিগকে দেখা দিল না, নির্জ্জনতার সহিত চিন্তার চিরদিন সখ্য ভাব, যেখানে নির্জ্জনতা, সেই খানেই চিন্তা; একাকী বসিয়া থাক, কোথা হইতে ভাবনা আসিয়া জুটিবে।

যে পক্ষী পোষা নয়. তাহাকে ধরিয়া আনিয়া যত যত্ন কর, যত সুমিষ্ট খাদ্য দাও কিছুতেই নূতন পরাধীনতা তাহার ভাল লাগে না। যে পর্য্যন্ত না তাহার পলায়নের উদ্যম বিফল হয়, যতক্ষণ না তাহার পরাধীনতা অভ্যস্থ হয়, সে পর্য্যন্ত তাহার আহার, পানীয় কিছুই ভাল লাগে না, গায়ে হাত বুলাইলে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিতে গেলে, বিপরীত ফল হয়। আজি দুইটী পৃথক পিঞ্জরে দুটী প্রণয়ের পক্ষী সেইরূপে অবরুদ্ধ; ক্ষীণ চঞ্চুতে বিকল যত্নে পিঞ্জর ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হইল!

ক্রমে সন্ধ্যা হইল, দেখিতে দেখিতে অন্ধকার আসিয়া সমস্ত পৃথিবীকে ঢাকিয়া ফেলিল, নীলগগনে তারকা মালা দেখা দিল। স্বর্গের দেব কন্যারা যেন দীপপুংক্তি জ্বালিয়া দীপান্বিতার ন্যায় সাজাইল, হেমন্ত কারাগারে রুদ্ধ, দিবা রাত্রি কিছুই অনুভূত হইবার নহে, কাজেই উভয়ই তাহার তুল্য। হেমন্ত আপন অবস্থার ও প্রভাবতীর অদৃষ্টের সমালোচনা করিতেছেন এমন সময়ে কারাগৃহের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া একটী মনুষ্য তাহাতে প্রবেশ করিল, আস্তে আস্তে হেমন্তের নিকটে আসিয়া বসিল মৃদুস্বরে কহিতে লাগিল,—"তুমি যদি ভাল চাও এ স্থান হইতে পলায়ন কর, নতুবা তোমার প্রাণ যাইবে।"

হেম। কেন?

মনু। তোমার প্রাণবধের উদ্যোগ হইতেছে।

হেম। এমন কি অনিষ্ট করিয়াছি যে হিন্দু হইয়া গ্রামবাসীরা ব্রহ্মহত্যায় ভয় করিতেছে না।

মনু। ইহার অনেক কথা আছে। গ্রামবাসীদের অজ্ঞাতে সম্পন্ন হইবে।

হেম। এই ত অবরুদ্ধ গৃহ, কিরূপেই বা পলায়ন করি।

মনু। আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিতে পারি।

হেম। একে অপরিচিত দেশ, তায় রাত্রি, ভদ্র

কুলাঙ্গনাকে লইয়া কিরূপে কোথায় যাইব? একা হইলে ভয় করিতাম না।

মনু। তাহার ভাবনায় তোমার কাজ কি, প্রাণ অপেক্ষা কে বড়?

হেম। এমন করিয়া পরিত্রাণ পাইতে চাই না।

মনু। তবে যাহা ইচ্ছা হয় কর।

হেম। কি করিব, যাহার জন্য জীবন দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যদি তাহাকেই না পাইলাম, তবে কারামুক্ত হইবার ফল কি? শরণাগতকে শত্রুহস্তে দিয়া আপনার মঙ্গল ইচ্ছা করিব এমন লোক আমি নহি। প্রাণ যায় যাউক তাহাতে ভীত নহি, জন্ম হইলেই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী তবে মৃত্যুকে ভয় করিলে চলিবে কেন? দেহক্ষয়কারী কীটরূপী পীড়ায় জর্জ্জরী-ভূত হইয়া বিকলেন্দ্রিয়ে ইহলোক হইতে অবসর লওয়া অপেক্ষা পরোপকারের জন্য জীবন ত্যাগ করা সহস্র গুণে শ্রেয়ঃ। জানিলাম, না হয় একজনের হিতের জন্য প্রাণ গেল, মনুষ্যদেহ ধারণে যদি অন্যের উপ-কার করিতে না পারা যায় তবে সে জীবন, সে জন্ম বিড়ম্বনা মাত্র। মনুষ্য জীবনে পরোপকার একটী প্রধান ব্রত,—বিশেষ নিরাশ্রয়া সদ্বংশজাত কুলস্ত্রীর জীবনে আমিই একমাত্র অবলম্বন,—এমত স্থলে নিজের জীবনের মমতা করিলে নিতান্ত হীনচেতার

কাজ করা হয়, বিপক্ষেরা যেরূপই হউক, মৃত্যু নিশ্চয় করিয়াছি।

মনু। যদি আপনার প্রাণ বাঁচাতে চাও তবে আমার পরামর্শ গ্রহণ কর, যদি তুমি একান্তই ঐ কামিনীকে ভালবাস তবে উপস্থিত থাকিয়া উহার দুরবস্থা দেখিলে তোমার চক্ষে শূল বিঁধিবে, অন্তরে বেদনা পাইবে, আপনিও প্রাণ হারাইবে ইহা অপেক্ষা আপনার প্রাণ লইয়া পলায়ন করা ভাল। আমি ভাল কথা বলিলাম, এখন তোমার যাহা কর্ত্তব্য কর।

হেম। জগতে এমন কাপুরুষের সংখ্যা অতি অল্প।

মনু। তবে দেখ।

হেম। আচ্ছা! শেষ না দেখিয়া স্বীকৃত হইতে পারিতেছি না। যতক্ষণ দেহে জীবন থাকিবে ততক্ষণ আশা ত্যাগ করিতে পারিব না।

এই সকল কথা বার্ত্তার পর মনুষ্যটী উঠিয়া, জোরে দ্বার বন্ধ করিয়া গৃহ হইতে চলিয়া গেল।

যতক্ষণ আমরা পাঠক মহাশয়কে হেমন্তের সহিত ঐ অপরিচিত মনুষ্যটীর কথা বলিতেছিলাম ঠিক সেই সময়েই প্রভাবতীর গৃহমধ্যে একটী স্ত্রীলোক প্রবেশ করিয়া প্রভাবতীকে নানাপ্রকার প্রলোভন দেখাইতেছিল।

প্রভাবতী সরলহৃদয়া, কপটতা শূন্য, দেবঘরের

বনে হেমন্তকুমারের সহিত সাক্ষাৎ হইবার পর অবধি হেমন্তানুরাগিনী, হেমন্তগত প্রাণ, এত অনুরক্তা যে যদিও হেমন্ত তাঁহাকে দুষ্টদিগের হস্ত হইতে না ছাড়াইতে পারিতেন তাহা হইলেও হেমন্তের জন্য তাঁহার মন ব্যাকুল হইত, প্রাণ কাঁদিত। তায় এতদিন তাঁহার সহিত একত্র বাসে, কথা বার্তায় তাঁহার গুণগ্রামের নিতান্ত পক্ষপাতিনী হইয়াছিলেন, এমতস্থলে প্রলোভনে কি হইতে পারে? কারাগারে প্রবিষ্টা স্ত্রীলোকটীকে যদিও আমরা অন্ধকারে দেখিতে পাই না কিন্তু কথা বার্তায় তাহাকে বেশ চতুরা বলিয়া বোধ হইল; স্ত্রীলোকটীকে বিদ্যাসুন্দরের মালিনীর উপযুক্ত বলিয়া বোধ হইয়াছিল, যে হেতু তাহার কথা বার্তায় গাম্ভির্য্য, সরলতা, সদাশয়তা, বহুদর্শীতা, বিদ্যাবত্তা ছিল না, কিন্তু মালিনীর বাক্ পটুতা, মনের কৌটীল্য এবং চতুরতা স্পষ্ট প্রকাশিত ছিল। স্ত্রীলোকটী বাগ্জালে প্রভাবতীকে ভুলাইতে চেষ্টা করিল, কথায় আকাশের ধন হাতে দেখাইতে লাগিল। সরলতা ও একাগ্রতার কাছে সকলই হারি মানে, প্রভাবতীর মন কিছুতেই ফিরাইতে পারিল না,—

পরাজয় স্বীকার করিয়া স্ত্রীলোকটী গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিল। আমরাও এইখানে এ পরিচ্ছেদটীর শেষ করিলাম।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ ।

কৃষ্ণচন্দ্র ।

কৃষ্ণচন্দ্র রঘুনাথের সহিত পরামর্শ স্থির করিয়া ছদ্মবেশে কুমারের অনুসরণে প্রবৃত্ত হয়। কুমার আলাগী ছাড়াইয়া বর্দ্ধমানে আইসেন, সে সময়ে কৃষ্ণচন্দ্র বর্দ্ধমানে থাকিয়া কুমারের বিনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হয়। তিলোত্তমার পিতা বহু অনুসন্ধানেও কন্যার উপযুক্ত পাত্র পাইয়াছিলেন না, তাহাতেই কৃষ্ণচন্দ্রকে কন্যাটী অর্পণ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, অনেক দিন হইতে কৃষ্ণচন্দ্রেরও ইচ্ছা ছিল যে তাহাকে বিবাহ করে; উদ্যানে কুসুম চয়ন করিতে গিয়া, গোলাপকে ফেলিয়া কে আর গাঁদাকে পছন্দ করে? সংসার উদ্যানে গিয়া কৃষ্ণ যে আমাদের গোলাপটীকে তুলিতে ইচ্ছুক হইয়াছিল, একথা সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে, কিন্তু অনুকূল ঘটনা না ঘটায় এতদিন তাহা প্রকাশ করিতে পারিতেছিল না, যখন তিলোত্তমার পিতা আপন মুখে দশ

জন্বার সমক্ষে প্রকাশ করেন যে কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত কন্যার পরিণয় দিবেন, তখন কৃষ্ণ পথ পাইল ; মনের মত কাজ হইল, — দিন কতক হাসি খেলায়, আমোদ আহ্লাদে, কাটাইতে লাগিল ; দশজন বন্ধু বান্ধবকে মনের কথা খুলিয়া ভাবী প্রণয়িনীর সৌন্দর্য্যের গর্ব্ব করিতে লাগিল, এইরূপে দিন দিন কৃষ্ণচন্দ্রের মনে কত নূতন নূতন আমোদের ঢেউ উঠিতে লাগিল. বিবাহ মাত্রেই দেখা যায় পাত্র ও কন্যা বিবাহকালে উভয়েই খুসী, কিন্তু এ বিবাহের পৃথক ব্যবস্থা। পাত্র কন্যা দুয়ের পক্ষান্তরে হাসি কান্না। সে আমোদে ভোর ; এমন সময় তিলোত্তমার সহিত কুমারের সাক্ষাৎ, মরু-ভূমিতে কুসুমবিকাশের ন্যায় সঙ্ঘটিত হইল। কৃষ্ণ-চন্দ্রের প্রণয়তরুতে বজ্রপাত হইল। সম্বন্ধের কথা উপ-স্থিত হওয়াবধি সে গোপনে চর রাখিয়াছিল, প্রতি-দিন দেখিত তিলোত্তমা কোন্ দিন কি করে, সেই চরের মুখেই কুমারের প্রণয়াঙ্কুরের কথা কৃষ্ণ শুনিয়া-ছিল। সেই অবধি তাহার মনে বিশ্বাস কুমারই যত অমঙ্গলের মূল ; তিনিই তাহার প্রণয়ের বিঘ্ন ; এখন কুমারকে বিনাশ ব্যতীত তাহার কোন অংশে শ্রেয়ঃ নাই। এই সিদ্ধান্ত করিয়া কৃষ্ণচন্দ্র গ্রামের একজন প্রসিদ্ধ বদমায়েস রঘুনাথকে প্রচুর সম্পত্তি স্বীকৃত হইয়া বহির্গত হইল। পূর্ব্বেই পাঠকগণকে বলিয়া

আসিয়াছি কুমার বর্দ্ধমানের রাজ কর্ম্মচারীর অনুরোধে সাঁওতালদিগের অবাধ্যতা নিবারণে নিযুক্ত হইয়া দেব-ঘর অঞ্চলে গমন করেন। দুরাত্মা কৃষ্ণচন্দ্র ও রঘু-নাথকে সঙ্গে লইয়া প্রচ্ছন্নভাবে কুমারের অনুসরণ করিল; ক্রমে দুই তিন মাস সঙ্গে সঙ্গে বেড়ায়, কুমন্ত্রণা সিদ্ধ করিবার কোন সুযোগ পায় না, কুমার রাজ নারায়ণ রাজকুমার,—বিদ্রোহ দমনে নিযুক্ত পাছে শত্রুগণ কোন অনিষ্ট করে, এজন্য সর্ব্বদাই দুই একটী সৈন্যদলে রক্ষিত হইতেন। তিনি ঘুণাক্ষরেও দুষ্ট কৃষ্ণচন্দ্রের ষড়যন্ত্র টের পান নাই। কুমার দুইমাস কাল নিয়ত অশ্বপৃষ্ঠে ভ্রমণ করিয়া দুই একটী সামান্য যুদ্ধে বিদ্রোহীদিগকে বশীভূত করিলে, কিয়দ্দিবস তথায় থাকিয়া দেশ ভ্রমণ ও মৃগয়া করিতে ইচ্ছা করি-লেন। এই সময়েই তিনি আলাটী হইতে তিলোত্তমার একখানি পত্র পাইয়াছিলেন, পত্রার্থ অবগত হইয়া তাঁহার একান্ত ইচ্ছা জন্মিয়াছিল যে তিনি সেই দিনই আলাটী যাত্রা করেন, কিন্তু মৃগয়ার সমস্ত আয়োজন হইয়াছে, ভৃত্যেরা সকলেই সংযত, পরদিন প্রভাতে মৃগয়াযাত্রা হইবে এমন সময় হঠাৎ তিলোত্তমার পত্র পাইয়া যদি সে বন্দোবস্ত পরিবর্ত্তন করেন তাহা হইলে ভৃত্যগণ পাছে এরূপ মনে করে যে কুমার কামিনী-প্রণয়ে এতাধিক বশীভূত যে ঈপ্সিত কার্য্য সমাধা না

করিয়াই তাঁহার নিকট গমনে অধীরা আলাটী যাইবার পূর্ব্বে তাঁহার ইচ্ছা ছিল কিছু অধিকদিন তথায় থাকিয়া তদ্দেশ পরিভ্রমণ করেন, কিন্তু এক্ষণে সে ইচ্ছা পরিবর্ত্তন করিলেন, কেবলমাত্র দুই দিন মৃগয়া করিলেই যথেষ্ট হইবে, তাহার পরে বর্দ্ধমান যাত্রা করিবেন এরূপ ঘোষণা দিলেন।

পরদিন অতি প্রত্যুষেই চারিজন সুদক্ষ সৈনিক সঙ্গে লইয়া তিনি মৃগয়ায় বহির্গত হইলেন, বন ব্যতীত অন্যত্র মৃগ সুদুর্ল্লভ, কাজেই এক দুর্গম বনে প্রবেশ করিলেন, তাঁহাদিগের দর্শনে, অশ্বের পদধ্বনিতে মৃগ সকল ত্রস্ত হইয়া ইতস্তত ছুটাছুটী করিতে লাগিল; সুদক্ষ কুমার ও তাঁহার সমভিব্যাহারী সৈনিকগণের মৃগয়াকৌশলে অনেকগুলি মৃগ বিনষ্ট হইল, সমভিব্যাহারী পদাতিকগণ তাহা সংগ্রহ করিয়া বনমধ্যে মৃগের স্তূপ করিয়া ফেলিল। বেলা প্রায় দশ দণ্ড অতীত, এমন সময়ে সমভিব্যাহারী চারিজন প্রতিনিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিল; কিন্তু এই সময়েই কুমারের সম্মুখ দিয়া একটী কৃষ্ণসার বিদ্যুতের ন্যায় দৌড়িতেছিল। শীকারীদিগের ধর্ম্ম এই যে শীকার দেখিলে তাঁহারা কখন বিমুখ হয়েন না, বেলা অধিক হইলে কি হয়, কৃষ্ণসারে কুমারের লোভ জন্মিল, তাহার প্রতি বল্গা শিথিল করিয়া অশ্বকে কশাঘাত করিলেন। তুল্যবেগে

অশ্ব মৃগের পশ্চাৎ দৌড়িল, ক্রমে মৃগটী দূরবনে প্রবেশ করিল। কুমারও তাহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়া অনুচরদিগের নিকট হইতে অনেক দূরে গিয়া পড়িলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না;—কৃষ্ণসারটী নিবিড় দুর্ভেদ্য জঙ্গলে প্রবিষ্ট হইয়া কুমারকে ফাঁকি দেখাইল। জঙ্গলটী কণ্টকময়, সহজে তাহাতে প্রবিষ্ট হইবার উপায় ছিল না কিন্তু কুমার অনেক চেষ্টা করিলেন, সে চেষ্টাও বিফল হইল, মৃগটীকে আর দেখিতে পাওয়া গেল না। বেলা প্রায় দ্বিতীয় প্রহর স্নান হয় নাই, তাহাতে এত দীর্ঘ পথ অশ্বারোহণে দৌড়িয়া আসায় তাঁহার অতিশয় শ্রমবোধ হইল, কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গেল। তখন অশ্ব হইতে নামিলেন, অশ্বের পৃষ্ঠ হইতে পর্য্যান নামাইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন এবং আপনি এক বৃক্ষ ছায়ায় উপবিষ্ট হইয়া শ্রান্তি দূর করিতে লাগিলেন, শরীর একটু স্নিগ্ধ হইলে তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইল, যেমন নিদ্রা আসিল, অমনি সেই বৃক্ষে ঠেশ দিলেন, তন্দ্রা হইল, চক্ষু অর্দ্ধমুদিত হইয়া আসিল। পাঠককে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কৃষ্ণচন্দ্র এক মুহূর্ত্তের জন্য কুমার রাজনারায়ণের অনুসরণে নিবৃত্ত নহে. দুরাত্মা এই বনেই ছিল, পূর্ব্বাহ্নে সন্ন্যাসী আশ্রমে হেমন্তকুমারের নিকট রমানাথ নামে পরিচিত হইয়াছিল সুবিধা বুঝিয়া এই সময়েই বৃক্ষান্তরাল দিয়া আসিয়া

এক সুতীক্ষ্ণ শাণিত খড্গো কুমার রাজনারায়ণের অঙ্গে আঘাত করিল, তাহাতেই শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়া গেল, এবং মৃত্যু হইয়াছে মনে করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

নিষ্ঠুর কৃষ্ণচন্দ্র মনে করিল, এতদিনে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল; এবং সহষে সন্ন্যাসী আশ্রমে উপস্থিত হইল। এই স্থানেই ছদ্মবেশধারী কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত হেমন্তকুমারের সাক্ষাৎ হয়, এই দুরাত্মারাই আত্মবিবরণ লুকাইবার জন্য আপনাকে রমানাথ ও সমভিব্যাহারীকে অটলবিহারী বলিয়া পরিচয় দিয়া ছিল। যাহারা আপনারা দুষ্ট, অবিশ্বাসী, বিশ্বাসঘাতক, তাহারা সকলেই আপনার মত দেখে সুতরাং হেমন্তকে সরোবরে স্নান করিতে দেখিয়া সে মনে করিল, এ ব্যক্তিইবা কেন এ বনে অনর্থক ভ্রমণ করিতেছে. দেখা যাউক তাহার কি অভিপ্রায়, আপনাদিগের ত কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে, তিলোত্তমার পাণিগ্রহণ নিশ্চিত আমার অদৃষ্টেই ঘটিল;—কুমারের মৃত্যুর কথা বলিলেই তিলোত্তমার আশালতা ছিন্নমূল হইবে। তখন আমি বই আর তার অন্য গতি থাকিবে না, বিশেষ ঐ সন্ন্যাসী আশ্রমে মহামায়ার নিকট মানসিক আছে সিদ্ধ কাম হইলে তাহাকে পূজা দিব। আগামী পৌর্ণমাসী তিথিতে দেবীর ঋণ পরিশোধ করিয়া স্বদেশ

যাত্রা করিব, আর সে দিন যোগেশ্বর সন্ন্যাসীর আশ্রমে যে একটী ষোড়শী দেখিয়া আসিয়াছি কোন সুযোগে তাঁহাকে লইয়া পলায়ন করিতে পারিলে রঘুনাথের যোগাড় হইবে, রঘুনাথ অনেক যত্ন অনেক পরিশ্রম করিয়াছে, রঘুনাথকে সন্তুষ্ট না করিলে ধর্ম্ম থাকে না। এই সকল মনে করিয়া কৃষ্ণচন্দ্র দুই'দিন দেব-ঘরের বনে থাকিয়াই দেখিল যে যোগেশ্বরের আশ্রম-বাসিনী ষোড়শী সন্ন্যাসিনী প্রভাবতী হেমন্তে অনুরক্ত, তখন কি উপায়ে হেমন্তের হস্ত হইতে যুবতী'কে লয় আবার তাহারই চেষ্টায় ফিরিতে লাগিল। প্রভাবতী পলায়ন কালে ছদ্মবেশী রঘুনাথ প্রভাবতীর হস্তে বিনষ্ট হইলে কৃষ্ণচন্দ্রের ক্রোধানল জ্বলিয়া উঠিল। তখন তাহার মনে প্রতিজ্ঞা হইল প্রভাবতী কেমন স্ত্রীলোক, তাহা দেখা আছে। কিন্তু প্রভাবতীর রূপই কৃষ্ণচন্দ্রকে পাগল করিয়াছিল। তখন রঘুনাথকে হত্যা জন্য তাহার উপর রাগ প্রশমিত হইল। লম্পটেরা প্রেম জানে না, তাহারা রূপেরই পক্ষপাতী, রূপ লাবণ্যবতী দেখিলেই লুব্ধ হয়। প্রভাবতী বনবাসিনী,—আপন সৌন্দর্য্যে অযত্নবতী হইলেও তাঁহার রূপের স্বাভাবিক রমণীয়তা কিছুতেই যাইবার নহে, বহুমূল্য বস্ত্র ময়লা মাখা থাকিলেও তাহার সৌন্দর্য্য লুক্কাইত থাকে না। সৌরভামোদী পুষ্প অরণ্যমধ্যে বিকসিত হইলেও

তাহার সুগন্ধ চাপা থাকে না। তবে কেনই না তাহার অসামান্য রূপরাশি কৃষ্ণচন্দ্রের মন আকর্ষণ করিবে।

নিগোনের সরাইয়ে যে হেমন্ত ও প্রভাবতী অবরুদ্ধ হইয়াছিল সে কেবল কৃষ্ণচন্দ্রের কুমন্ত্রণায়, বন পরিত্যাগ করিয়া অবধি কৃষ্ণচন্দ্র হেমন্তের সহিত প্রভাবতীর প্রণয়-রজ্জু ছিন্ন করিতে চেষ্টা করিতেছিল, পথে কোথাও কোন সুযোগ পায় না, নিগোনে আসিয়া সেখানকার ফাঁড়িদার, পাইক, মণ্ডলদিগকে প্রচুর ধন দিয়া বশীভূত করে। পল্লীগ্রামের প্রধান পক্ষ লোকেরা প্রায় অর্থপ্রিয়, অর্থের লোভে ধর্ম্মভয় ত্যাগ করিতে কুন্ঠিত হয় না। ফাঁড়িদার পাঁচ শত, মণ্ডলে দুই শত ও পাইককে এক শত টাকা লইয়া তাহার কাছে প্রতিশ্রুত হয়, সে যেরূপ ইচ্ছা করে, সেইরূপেই মনের মত কাজ করিয়া লইতে পারে, তাহারা তাহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিবে। কিন্তু ফাঁড়িদার সাহেব তেমন লোক নহে, যখন প্রভাবতীর রূপমাধুরী তাহার দৃষ্টিপথে দাঁড়াইল, সেই মূর্ত্তি, সেই অঙ্গভঙ্গি, তাহার হৃদয়ফলকে অঙ্কিত হইয়া গেল; অধর্ম্মের কুটীল গতি বুঝিয়া উঠে এমন সাধ্য কার! তখন কৃষ্ণচন্দ্রের টাকা হস্তগত হইয়াছে, তাহার নিকট হইতে আর কোন প্রত্যুপকারের আশা নাই। ফাঁড়িদার এখন যুবতীর পক্ষ, প্রভাবতীর সহিত হেমন্তের একমন, একপ্রাণ, পাঠক-

গণের বিশ্বাস আছে, যে প্রভাবতীর পক্ষপাতী সেই হেমন্তকে ভালবাসিবে, সেই হেমন্তকে যত্ন করিবে, হেমন্তের সুখে সে সুখী, হেমন্তের দুঃখে সে দুঃখী। কিন্তু ফাঁড়িদারের অভিপ্রায় সম্পূর্ণ বিপরীত। সুতরাং ফাঁড়িদার প্রভাবতীর পক্ষ হইয়াও হেমন্তের শত্রু,— তাহার ইচ্ছা কোন প্রকারে যুবতীকে হস্তগত করিয়া কৌশলে কৃষ্ণচন্দ্রকে ফাঁকি দেয়। ফাঁড়িদার এখন হইতে চেষ্টা করিতে লাগিল, কি উপায়ে কৃষ্ণচন্দ্র ও হেমন্ত দূরীভূত হয়। পাঠকগণ দেখুন প্রভাবতীর অদৃষ্ট কেবলমাত্র দুঃখের লীলাস্থল। কতবার নূতন দুঃখ, নূতন বিপদ একটার পর আর একটা আসিয়া জুটিতেছে। ললাট লিপিকর ভ্রমেও সুখের কলম প্রভাবতীর অদৃষ্টফলকে চালনা করেন নাই। জগতে এরূপ দুর্ভাগ্যবতী যুবতীর মত দ্বিতীয় আর দেখা যায় না।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

—※—

কুতুব খাঁ।

যখন দিল্লীর সম্রাট জাহাঙ্গীর যৌবনাবস্থায় পিতৃসন্নিধানে অবস্থিতি করিতেন, তখন তিনি ভুবনমোহিনী নূরজেহান নাম্নী যুবতীর প্রণয়লাভে ব্যাকুল হইলে ন্যায়পরায়ণ আকবর পুত্রের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া পাত্রান্তরে কন্যাটী সম্প্রদান জন্য তাহার পিতাকে অনুরোধ করিলেন, তদনুসারে কন্যার পিতা সের আফগাণ নামক বর্দ্ধমানের তদানীন্তন কর্ম্মচারীকে এই রূপবতী কন্যাটীর বিবাহ দিয়া কুমার জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে স্থানান্তরিত করিলেন। কিন্তু নূরজেহানের অলোকসামান্যকান্তি জাহাঙ্গীরের মন হইতে অপসৃত বা কোনমতে নূরজেহানের প্রতি তাঁহার আশক্তির হ্রাস হইল না। যথাসময়ে সম্রাট আকবর পরলোক হইলে কুমার জাহাঙ্গীর তদীয় সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইলেন। রাজকার্য্য সম্পাদনে বা

রাজ্যের নিয়ম পরিবর্ত্তনে তাঁহার যে যে ইচ্ছা ছিল, সেই সমুদয় সুসম্পন্ন করিবার পূর্ব্বে নুরজেহানের পাণিগ্রহণ তাঁহার লক্ষ্য হইল। তৎকালে তাঁহার শ্যালক মহারাজ মানসিংহ বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। নূতন সম্রাট তাঁহা দ্বারা আপনার বাসনা চরিতার্থ হইবার প্রতিকূলতা সন্দেহ করিয়া পাঠান কুতুবউদ্দীনকে বাঙ্গালা দেশের শাসনভার অর্পণ করিয়া এদেশে পাঠাইয়া দেন, সেরখাঁর বিনাশ সাধন জন্যই কুতুবের বঙ্গে আগমন, এজন্য মুরশিদাবাদ পৌঁছিয়াই তিনি বর্দ্ধমান যাত্রা করেন। মুরশিদাবাদ হইতে বাহির হইবার সময়েই কোন্ দিন কোথায় অবস্থিতি করিয়া কোন্ কোন্ স্থান পরিদর্শন করিয়া আসিবেন, তাহা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, নিগোনে একটী হাট, কতকগুলি ভদ্র লোকের বাস থাকায় নিকটবর্ত্তী সমস্ত গ্রাম অপেক্ষা উহা একটী ভাল জায়গা, এজন্য তথায় একদিন ছাউনির বন্দোবস্ত হইয়াছিল। যে দিন আমাদের হেমন্ত ও প্রভাবতী অবরোধে প্রবেশ করেন তাহার দুই দিন পরে কুতুব খাঁর শিবির ঐ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। তৎকালীন বাঙ্গালার সুবাদার মফস্বলে বাহির হইলে অনেক লোকজন, সৈনিক, হস্তী, ঘোটক, দলবল সঙ্গে যাইত। বিশেষ কোন কার্য্য ব্যতীত তখনকার নবাবদিগের মফস্বলে গমন হইত না। যদি

দৈবাৎ কোন কারণে কখন ঘটিত তাহাতে অতিশয় ধুমধাম, মহা আড়ম্বর হইত।

নবাব সাহেব নিগোনে আসিয়া পৌছিলে গ্রামটী অতিশয় জনাকীর্ণ হইয়া উঠিল, কোথাও সৈনিক পুরুষদিগের ছাউনি, কোথাও রাজ কর্ম্মচারীদিগের বাসা, কোথাও সামান্য ভৃত্যদিগের আড্ডা, এই প্রকারে গ্রামটী ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল, গ্রামের যেখানে সেখানে নবাবের অনুচরবর্গ দৃষ্ট হইতে লাগিল। গ্রামের বহির্দেশ অশ্ব ও হস্তীতে পরিপূর্ণ হইল। চৌকীদার, ফাঁড়িদার প্রভৃতি শান্তিরক্ষকেরা দিবারাত্রি শ্রম করিয়া আপনাদিগের কার্য্য-কুশলতা দেখাইতে লাগিল, যে ফাঁড়িদার সাহেব গ্রামের মধ্যে একজন মান্য গণ্য, মোকদ্দমা মামলা বা বিবাহ, পর্ব্ব, মহোৎসব উপস্থিত হইলে সর্ব্বত্র অধ্যক্ষতা করিত, সে আজি সামান্য ব্যক্তির ন্যায় সামান্য কার্য্যের জন্য সর্ব্বত্র দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিল, যে গৃহস্থের কুটীরে বহু যত্ন, সাদর নিমন্ত্রণে যাহার সাক্ষাৎ পাওয়া যাইত না, সেখানে আজি বিনা আহ্বানে সামান্য কার্য্যের জন্য সে সমুপস্থিত। গ্রামস্থ ভদ্র প্রধানপক্ষ লোকেরা নবাব সাহেবের অনুগ্রহ লাভের জন্য যে যেমন সকলেই সাধ্যানুসারে পরিশ্রম করিতে ব্যস্ত। বঙ্গদেশের নবাবেরাই সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন, দীল্লির সম্রাটগণ কেবল

মাত্র বার্ষিক কর গ্রহণ করিতেন, আর সমস্ত কাজই নবাবদিগের দ্বারা সম্পন্ন হইত। সুতরাং নবাবদিগের অনুগ্রহ লাভ প্রজার পক্ষে সামান্য বিষয় নহে।

নবাব সাহেব আসিবার পূর্ব্বে রমজান আলী প্রভাবতীকে হাতে আনিতে পারিয়া ছিল না। কাজেই পূর্ণকাম হইতে পারে নাই, এখন আপনার আশা ছাড়িয়া দিয়া নবাব সাহেবকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেও যথেষ্ট হয়, এই মনে করিয়া স্বয়ং প্রভাবতীর নিকটস্থ হইল। প্রভাবতী অন্ধকারময় গৃহে নিরুদ্ধা, দিবালোক তথায় প্রবেশ করিতে অক্ষম, রমজান আলী আস্তে আস্তে সেই গৃহের দ্বার উদ্ঘাটন করিল,—মুসলমান মূর্ত্তি দেখিয়াই যুবতীর প্রাণ উড়িয়া গেল। ব্যাধ গৃহাবরুদ্ধা বিহঙ্গিনীর ন্যায় থর থর কাঁপিতে লাগিলেন। রমজান আলী তাহাকে দেখিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "ভয় নাই;—যাহা বলি কর, তোমার অদৃষ্ট বড় ভাল, তাই আজি নবাব সাহেব আসিয়াছেন, এখন তাঁহার নিকট আসিয়া দেখা কর। যদি নবাব তোমাকে দেখিয়া পছন্দ করেন, তবে তোমার ভাগ্য ফিরিবে;—তুমি তাঁহার বেগম হইয়া চিরকাল সুখে কাটাইবার পথ পাইবে। তোমার মত কত শত হিন্দুকন্যা সুখ ঐশ্বর্য্য দেখিয়া তাঁহার বেগম হইয়াছেন, তোমার যে রকম রূপের ছটা দেখিতেছি তাহাতে আমি নিশ্চয়

বলিতে পারি তোমাকে নবাব সাহেবের নজর ধরিবে, তুমি বেগমদিগের মধ্যে সকলকার প্রধান হইতে পারিবে, তাহা হইলে তুমি এই এতবড় বাঙ্গালাদেশের সর্ব্বেশ্বরী হইবে, যা ইচ্ছা তাই করিতে পারিবে। নবাবের ঘরের ধন, সুখ সম্পত্তি দেখিলে তোমার ঘরে ফিরিয়া যাইতে মন হইবে না। তোমার ভালর জন্যই বলিতেছি, এখন অন্য মত করিও না আমার সঙ্গে এস, আমি নবাব সাহেবকে তোমার জন্য বলিয়া দিব।"

ফাঁড়িদারের কথাগুলিতে প্রভাবতী প্রবল ঝটিকা বিকম্পিতা কদলীর ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন; মুখে কথা আসিল না যে ফাঁড়িদারকে উপযুক্ত উত্তর দেন; বিশুষ্ক-কণ্ঠে, ভয়মলিন মুখে কহিলেন,—আমাকে ঐশ্বর্য্যের লোভ দেখাইবেন না, ঐশ্বর্য্যের কথা শুনিলে দুঃখ হয়! বিপুল বিভব, অগণিত হস্তিযূথ, সুশিক্ষিত বেগবান তুরঙ্গম অনেক দেখিয়াছি, এ সকল আমার চক্ষে কিছুই নূতন নহে, সুবর্ণ কবচ, হীরক জড়িত পরিচ্ছদধারী সুসজ্জীভূত বীররসের সাক্ষাৎ অবতার-স্বরূপ শত শত সৈন্য, যাহাদিগকে দেখিলে সামান্য কামিনীদিগের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, এমন অসংখ্য সেনানিবেশ কত শতবার দেখিয়াছি। পদাতিক, হয়, হস্তী, রথ, রথী, আপনি যা কিছুরই জন্য বঙ্গেশ্বরের

গৌরব করিতেছেন, সে সকল আমার কিছুরই অভাব ছিল না, বরং নিয়ত পথে ঘাটে তাহাদিগকে যখন তখন কোলাহল করিতে দেখিয়া মনে বিরক্তি জন্মিত। হিন্দু কুল-ললনা হইয়া সামান্য ঐশ্বর্য্যের জন্য যবনহস্তে অমূল্য সতীত্বনিধি বিনিময়ে কোনমতে শ্লাঘা বোধ করিতে পারি না। পবিত্র আর্য্যকুলকলঙ্কিনী যে সকল অঙ্গনা অকিঞ্চিৎকর ঐহিক বিলাস সুখভোগের লোভে যবনপতির করে স্ত্রীজন্ম দুর্ল্লভ মহার্ঘ রত্ন উপহার দিয়া সুখ সাগরের কমল হইয়া বসিয়াছেন, তাঁহাদিগের সুখ, তাঁহাদিগের ঐশ্বর্য্য, তাঁহাদিগের বিভব তাঁহাদিগেরই থাকুক; তেমন ভোগ সুখ বাসনা আমি কখন ভ্রমেও প্রত্যাশা করি না, জন্ম-জন্মান্তরে ঈশ্বর যেন এমন দুর্ম্মতি না দেন। যে সংসারসুখে বিরাগিনী সে সন্ন্যাসিনীর রাজ্যেশ্বরী হইবার লোভই কেন? যে সর্ব্বত্যাগিনী হইয়া সকল সুখ ভাসাইয়া বসিয়াছেন তার আবার বিষয় লালসাই বা কেন? জীবের জীবন আর স্ত্রীলোকের সতীত্বের মূল্য নাই। সাধ্বী পতিব্রতা স্ত্রী যদি সমস্ত দিন অনশনে, ভীষণমরু দুর্গমগিরিগুহা, কণ্টকিত তরুগুল্ম সমাকুল বিজন কান্তারে সিংহ শার্দ্দুলাদি হিংস্রশ্বাপদসমিতি মধ্যে ভর্ত্তাসহবাসে চিরকাল ক্ষেপণ করিতে পায়, তবে তাহার অমরাবতী বাসও সুখকর নহে। আপনি বিজ্ঞ, বিবেচক হইয়া

অল্পবুদ্ধি অবলাকে অসৎ পথবর্ত্তিনী হইতে কেন পরামর্শ দিতেছেন? গুরুজনের মুখে শুনিয়াছি।"

কি ছার কামিনী সুচারু বদন?
কি ছার তাহার রত্ন আভরণ,
কি ছার কমল বদনের শোভা,
কি ছার মৃগাক্ষ জন মনলোভা,
কি ছার তাহার বর্ণ সুচিক্কণ,
কি ছার আগুল্ফ কেশের পতন,
কি ছার তাহার মরাল গমন?
যদি সে হারায় সতীত্ব রতন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

কুতুব খাঁর দরবার।

দুরাত্মা রমজান আলী যখন দেখিল ভয়, প্রলোভন, মিত্রতা প্রদর্শন প্রভৃতি কিছুতেই আমাদিগের দুইটী যুবক যুবতীর মন পাইল না, তখন কি করে আপনার আশা ত্যাগ করিয়া তাহাকে নবাবের হস্তে তুলিয়া দিতে উদ্যত হইল। রমজান একবারে লোভ পরিত্যাগ করিতে পারিল না। একবার অগ্রসর হয়, আবার পশ্চাৎ হটিয়া পড়ে, মনের আশা, যদি আর দুএক দিন অবরুদ্ধ রাখিলে ইষ্ট লাভ হয়। কিন্তু দুরাত্মা কৃষ্ণচন্দ্র গুপ্তমন্ত্রণায় প্রতিনিয়ত উত্তেজিত করিতেছিল, হয় প্রভাবতীকে হেমন্ত হইতে পৃথক করিয়া তাহার হস্তে দেয়, না হয় যবনরাজের হস্তে দিয়া তাহার প্রণয়শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া জীবনের সমস্ত আশা ভরসা মিটাইয়া দেয়। মূর্খ কৃষ্ণচন্দ্র রমজান আলীর মনের ভাব অবগত ছিল না। রমজান আলী যে গোপনে

আপন কার্য্য সাধনের উপায় দেখিতেছিল একথা কৃষ্ণ-চন্দ্র ঘুণাক্ষরেও টের পায় নাই। ক্রমে নবাবের নিগোনে থাকিবার নির্দ্দিষ্ট সময় ফুরাইয়া আসিল; রমজান আলী কোনমতে আর বিলম্ব করিতে পারিল না, তাহার মনের ভয় পাছে নবাব কোনমতে তাহার অভিসন্ধি জানিতে পারেন, তাহা হইলে তাহার জীবন সংশয়। প্রাণের ভয়েই ফাঁড়িদার প্রভাবতীকে নবাবের হাতে দিতে ইচ্ছা করিয়াছিল, নতুবা সে একবারের জন্যও মনের মধ্যে ধর্ম্মভয়কে স্থান দেয় না। প্রভাবতীকে বশে আনিতে পারিলে হেমন্ত ও কৃষ্ণ-চন্দ্রকে তাড়াইতে রমজান আলীর অনেক উপায় ছিল। কিন্তু কি করিবে যুবতী কোনমতে হাতে আসিল না, রমজান আলীর ক্রমিক আট দশ দিনের চেষ্টা, যত্ন ব্যর্থ হইল। মুসলমান ফাঁড়িদার তখন উপায়ান্তর বিহীন ও ভগ্নাশা হইল, অন্তরে অতিশয় ব্যথা পাইল, কি করে প্রতিকারের কোন হাত ছিল না, চিন্তা করিবার আর সময় নাই জানিয়া অগত্যা অনিচ্ছার সহিত যুবক যুবতীকে নবাব সাহেবের হাতে তুলিয়া দিল।

বেলা অবসান প্রায়, নবাব কুতুবউদ্দীন এজলাসের কাজ শেষ করিয়া উঠিতে যাইতেছে এমন সময় রমজান আলী দরবারে উপস্থিত হইয়া হেমন্ত প্রভাবতীকে লইয়া মোকদ্দমা পেশ করিয়া দিল। হেমন্তের সুকু-

মার দেহকান্তি ও মুখশ্রীর অমায়িকতা দেখিয়া নবাবের কঠিন হৃদয়ে দয়ার উদয় হইল, কৌমারাবস্থায় তাঁহার সন্ন্যাসীর সজ্জা দেখিয়া অন্তঃকরণ ব্যথিত হইল,—তখন প্রভাবতী বিনতবদনে হেমন্তের পশ্চাতে দণ্ডায়মানা ছিলেন, প্রথমে তাঁহার দিকে নবাবের দৃষ্টি পতিত হয় নাই। ক্ষণেক পরে যখন তিনি জিজ্ঞাসিলেন, "পশ্চাতে ওটী কে?" রমজান আলী সাগ্রহে উত্তর দিল;—"ওটী স্ত্রীলোক, এই পুরুষটীর সঙ্গিনী।" তখন মুসলমানপতি প্রভাবতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, পদাঙ্গুষ্ঠ হইতে কেশাগ্র পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করিলেন, প্রভাবতীর সেই সন্ন্যাসিনীর বেশ নবাবের চিত্ত আকর্ষণ করিল, নবাব অবাক হইলেন, তাঁহাদিগের অপরাধের বিচার করা দূরে গেল,—উভয়ের লাবণ্য দর্শনে চমৎকৃত হইলেন, বন্য ফল মূলাদি ভক্ষণে এই অযত্নরক্ষিত কলেবর এতাধিক রূপরাশি কিরূপে সমবেত হইল, এই সিদ্ধান্ত করিতেই তাঁহার অধিক সময় অতিবাহিত হইল। দরবারের সকল ব্যক্তিই আপন আপন কার্য্য ত্যাগ করিয়া মোহিনীমূর্ত্তি দুইটী দেখিতে লাগিল, ভূলোকে দেবমূর্ত্তি আবির্ভূত হইলে মর্ত্তবাসীরা স্বর্গীয় রূপপ্রভায় যেমন অনিমিষ লোচন ও নির্ব্বাক হইলে সেই স্থান নীরবতা প্রাপ্ত হয় নবাব কুতুব খাঁয়ের শিবিরও এক্ষণে সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইল।

নবাব দরবার সর্ব্বদাই কর্ম্মচারীদিগের কথা বার্ত্তায় কলধ্বনিতে পূর্ণ থাকে, অকস্মাৎ এরূপ নিস্তব্ধতার কারণ কি জানিবার জন্য পটমণ্ডপের অন্তঃপুর হইতে বেগমের সহচরীগণ সোৎসুকে পটমণ্ডপের অন্তর্দ্বার মুক্ত করিয়া দরবারে দৃষ্টিপাত করিলে সমস্ত ব্যাপার তাহাদিগের হৃদয়ঙ্গম হইল। তাহারা অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া বেগম বিবীজানকে সমস্ত কথা জানাইল; সামান্য কৌতুকের বিষয় নয়। মনুষ্যমূর্ত্তি দেখিয়া দরবারশুদ্ধ লোক বিস্মিত, কেমনই রূপ। কেমনই মনুষ্য! দেখিবার জন্য বেগমের কৌতূহল জন্মিল। তিনি পটমণ্ডপদ্বারের পর্দ্দা তুলিয়া যুগলমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন, পুরুষটীকে দেখিয়া চিনিলেন, কিন্তু যুবকের তাপসের বেশ দেখিয়া তাঁহার কোমল হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল; হেমন্তের কাঞ্চনকান্তি তৈলবীহিন সূক্ষ্ম কুঞ্চিত কেশে রুক্ষতা দেখিয়া তিনি ব্যাকুলিনী হইলেন, প্রাণ ব্যাকুলিত হইতে লাগিল, যেন পিঞ্জরাবরুদ্ধ বিহঙ্গিনী মুক্তপথে উড্ডীন হইতে উৎসুক। হেমন্তের প্রত্যেক অঙ্গে, প্রত্যঙ্গে, অযত্নতাজনিত চিহ্ন সমুদায় ক্রমে ক্রমে নবাবমহিলার যতই দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল, তিনি ততই ব্যস্ত, ততই অধীরা হইতে লাগিলেন। যতক্ষণ না তিনি স্বহস্তে সেই সমুদায় ঘুচাইয়া দিতে পারিতেছেন ততক্ষণ তাঁহার চক্ষে যেন শূল বিদ্ধ হইতে ছিল,

যতক্ষণ না সন্ন্যাসীর বেশ ঘুচাইয়া দিব্য পট্টবাসে তাঁহার অঙ্গ সাজাইতে পারিতেছিলেন ততক্ষণ যেন আপনার কত অলক্ষণ, কত অশুভ কল্পনা করিতেছিলেন। যে সময় আমরা পাঠককে বেগমের ব্যাকুলতার কথা অবগত করিতে ছিলাম সেই সময়ের মধ্যে তিনি কেবল এইমাত্র চেষ্টা করিতেছিলেন যে, কিরূপে হেমন্তের দৃষ্টি তাঁহার দিকে ফিরিয়া পড়ে। নবাবের পশ্চাদ্দিকেই অন্তঃপুরের প্রবেশ দ্বার, সেই দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াই বেগম হেমন্তের দৃষ্টি প্রার্থনা করিতেছিলেন এবং হেমন্তও নবাবের সম্মুখে দণ্ডায়মান, নবাবের মুখের দিকে তিনি দৃষ্টিপাত করিলেই, বেগম সেই শুভ দৃষ্টির অংশভাগিনী হইবেন। হেমন্ত ভূতলে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দণ্ডায়মান ছিলেন, কিয়ৎক্ষণের পর যখন নবাব সাহেব ফাঁড়িদারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই যুবক যুবতীকে কি দোষে দোষী করিয়া আমার নিকট অর্পণ করিলে?"

ফাঁড়ি। ধর্ম্ম অবতার। এই দুই জনে এই গ্রামের এক ব্যক্তির ঘর জ্বালাইয়া দিয়াছে।

নবাব। তুমি কি করিয়া জানিলে যে, ইহারাই ঘর জ্বালাইয়াছে?

ফাঁড়ি। হুজুর! আমি ইহার জন্য বিশেষ প্রমাণ লইয়া জানিয়াছি যে ইহারাই নিশ্চয় ঘর জ্বালাইয়াছে।

নবাব। আচ্ছা! সেই সকল সাক্ষী এবং যাহার গৃহ দাহ হইয়াছে তাহাদিগকে লইয়া আইস।

ফাঁড়ি। যে আজ্ঞা হুজুর! তাহারা সকলেই এখানে উপস্থিত।

নবাব। যদি প্রমাণ না হয়, তবে তোমার প্রাণ দণ্ড হইবে। এখন যাহার গৃহ তাহাকে উপস্থিত কর।

গৃহস্বামী। ধর্ম্ম অবতার। এই দুই জনে আমার ঘর জ্বালাইয়া দিয়াছে, হুজুর আমি গরিব লোক অতএব আপনি ইহার যথার্থ বিচার করুন।

নবাব। তুমি কিরূপে জানিলে যে ইহারাই তোমার গৃহ দাহ করিয়াছে?

গৃহস্বামী। আজ্ঞে! সকলেই বলিল।

নবাব। তুমি নিজে দেখ নাই?

গৃহস্বামী। আজ্ঞে! নিজেও দেখিয়াছি।

নবাব। কখন্ তোমার গৃহ দাহ হইয়াছিল?

গৃহস্বামী। আজ্ঞে। রাত্রি তিন প্রহরের সময়।

নবাব। তোমার বাটী হইতে ঐ ঘর কত দূরে?

গৃহস্বামী। আজ্ঞে। একপোয়া আন্দাজ দূরে।

নবাব। তুমি অতদূর থেকে দেখলে যে এই দুই জনে তোমার ঘর জ্বালাইয়া দিল?

গৃহস্বামী। আজ্ঞে না পাঁচ জনের মুখে শুনলেম।

নবাব। এখনি বল্লে, আমি নিজে দেখিয়াছি, আবার বল্‌ছো পাঁচজনের কাঁছে শুন্‌লেম? অতএব তোমার কথায় আমার বোধ হচ্ছে, কোনরূপ ষড়যন্ত্রে এই যুবক ও যুবতীকে বিপদে ফেলিবার জন্য এইরূপ মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপিত করিয়াছ। এখন যদি সত্য কথা না বল তবে তোমার প্রাণ বিনাশ করিব। অতএব শীঘ্র সত্য কথা বল?

গৃহস্বামী। ধর্ম্ম অবতার। ফাঁড়িদার সাহেব গৃহ দাহ হইবার পূর্ব্বরাত্রে আমাকে থানায় লইয়া গিয়া বলিল যে তোর ঘরখান আজ রাত্রে পোড়াইয়া দে, তাহাতে আমি বলিলাম যে ঘর পোড়াইলে আমার অনেক ক্ষতি হইবে, এবং জিনিস পত্র সব নষ্ট হইবে, অতএব আমি কি জন্য ঘর পোড়াইব, বিশেষ দুটী লোক আজ রাত্রে সেখানে আছে তাহারাও ঐ সঙ্গে পুড়িয়া মরিবে। তাহাতে ফাঁড়িদার বলিল, আচ্ছা তুই পাঁচ শত টাকা লইয়া ঘরখানা পোড়াইয়া দে। কাজেই টাকার লোভে এরূপ কার্য্য করিয়াছি।

নবাব। আচ্ছা, ফাঁড়িদার কত টাকা পাইয়াছে তাহা তুমি জান, এবং আর কোন্ কোন ব্যক্তি টাকা লইয়াছে তাহা জান?

গৃহস্বামী। ধর্ম্ম অবতার! আমি পাঁচ শত টাকা ফাঁড়িদার সাহেব পাঁচশত টাকা, গ্রামের মণ্ডল তিনজন

দুইশত টাকা করিয়া, পাইক দশজন একশত টাকা হিসাবে পাইয়াছে।

নবাব। এত টাকা কে দিয়াছে?

গৃহস্বামী। একটি ছোকরা, তাহার নাম রমানাথ।

নবাব। কি জন্য সে এত টাকা দিল?

গৃহস্বামী। হুজুর! এই মেয়ে মানুষ এবং পুরুষ মানুষটিকে জব্দ করিবার জন্য।

নবাব। ফাঁড়িদার সাহেব! এখনত সকল গুপ্ত কথাই প্রকাশ হ'লো, এখন তুমি গুরুতর দোষে দোষী। এই দোষের জন্য তোমার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল, আর তিন জন মণ্ডলের, গৃহস্বামীর, পাইকগণের এবং ঘুষদাতা যুবকের চৌদ্দবৎসর কঠিন কারাবাস নির্দ্দিষ্ট হইল। (নবাব হেমন্ত ও প্রভাবতীকে লক্ষ্য করিয়া) তোমরা দুই জনে বেকসুর খালাস পাইলে।

হেমন্ত। (অভিবাদন পূর্ব্বক) হুজুরের কৃপায় আজ আমরা দুইজনে পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত হইলাম।

নবাব। তোমার বাড়ী কোথায়?

হেমন্ত। অধিনের বাড়ী মুর্শিদাবাদ।

নবাব। এ স্ত্রীলোকিটী কে?

হেমন্ত। আমার সমভিব্যাহারিণী।

নবাব। রমানাথ নামক ব্যক্তি কি জন্য তোমাদিগকে নষ্ট করিতে উদ্যত?

হেমন্ত। অধীন তাহার কিছুমাত্র অবগত নহে।

নবাব। এখন তোমরা কোথায় গমন করিবে?

হেমন্ত। বর্দ্ধমানের নিকট আলাটী গ্রামে।

নবাব। আমরাও বর্দ্ধমানে যাইব, অতএব কল্য আমাদের সঙ্গেই চলনা কেন?

হেমন্ত। হুজুরের সঙ্গেই গমন করিবার ইচ্ছা আছে, যে হেতু যেরূপ ষড়যন্ত্র দেখিলেন, তাহাতে স্ত্রী-লোক সঙ্গে করিয়া একাকী গমন করিতে বাসনা নাই।

নবাব। আচ্ছা। তোমার কোন আশঙ্কা নাই কল্য আমাদের সঙ্গেই বর্দ্ধমান যাইবে, তোমার কোন কষ্ট হইবে না।

হেমন্ত। যে আজ্ঞা।

এইরূপে নবাব সাহেব দোষীগণের দণ্ডবিধান করিয়া হেমন্ত এবং প্রভাবতীকে অব্যাহতি দিলেন। নবাব সাহেবের আদেশক্রমে ফাঁড়িদার রমজান আলী তৎক্ষণাৎ ঘাতকের হস্তে নিহত হইল, বাকী আসামী-গণকে তৎক্ষণাৎ প্রহরী-বেষ্টিত করিয়া রাজধানী মুর্শি-দাবাদে চালান করা হইল, কেবল কৃষ্ণচন্দ্র ওরফে রমা-নাথকে খুজিয়া পাওয়া গেল না, সে নবাব সাহেবের হুকুম শুনিয়াই তথা হইতে পলায়ন করিয়াছিল, অনেক অনুসন্ধানে তাহাকে না পাওয়াতে নবাব সাহেব অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া তাহাকে ধরিবার জন্য চতুর্দ্দিকে গুপ্ত

চর প্রেরণ করিলেন এবং আজ্ঞা দিলেন যে ধৃত হইলেই তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। এই আজ্ঞা দিয়া নবাব সাহেব দরবার ভঙ্গের ঘোষণা দিলেন।

এইরূপেই নির্দ্দোষীর বিচার সর্ব্বত্র সমাধান হইয়া থাকে, সত্য কুত্রাপি গোপন থাকিবার নহে। নবাব কুতুবখাঁ অনুচরবর্গকে আদেশ দিলেন, "আমাদের পটমণ্ডপ সমীপে কোন স্থানে এই দুইটী যুবক যুবতীকে যেন যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া দেওয়া হয়, এবং বর্দ্ধমান যাত্রাকালে রাজকর্ম্মচারীদিগের সহিত কোন যানযোগে তাঁহাদিগকে বর্দ্ধমান লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হয়।"



দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

হতাশের আশার সফলতা।

নবাব কুতুব উদ্দীন এজলাস ভঙ্গ করিয়া বৈকালিক ভোজন করিলেন এবং এক দল অশ্বারোহী পুরুষ সঙ্গে লইয়া নিগোনের নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমুদায় পরিদর্শনে বহির্গত হইলেন। সন্ধ্যা হইল, ক্রমে রাত্রির অন্ধকারে পৃথিবী ঢাকিয়া আসিল,—বেগম সাহেব তখন আপন অনুচারিণী দেলজানের নিকটে গিয়া কহিলেন,—"দেলজান! আমাকে একখানা সাড়ি দাও।"

দেল। এত দিনে কি পুরাতন শোক জ্বলিয়া উঠিল নাকি?

বেগম। ছেলেবেলার অভ্যাস কি কখন ভুলা যায়? আজি দুদিন বইত নয় ঘাঘরা পরা, ওড়না গায়ে দেওয়া শিখেছি।

দেল। আমিও ত তাই বল্‌চি যে আজি আমাদের নবাবজাদির নির্ব্বাণ শোক জ্বলে উঠেছে।

বেগম। সাধ গেল তাই পরিতে চাইতেছি, তাহাতে যদি শোক তাপের কথা কও নাইবা পরিলাম। এতদিন এই যে ঘাঘরা পরেছিলাম, তায় কি আর দিন যাচ্ছিল না?

দেল। রাগ কর ত বলি না।

বেগম। এতে আবার রাগ কোথা থেকে এলো?

দেল। এই ঢাকাই সাড়ি খানিহ পর।

বেগম। দাও।

দেলজানের হাত হইতে ঢাকাই কাপড় খানি লইয়া বেগম সাবধান পরিধান করিয়া তাহাকে কহিলেন, দেলজান! দেখ দেখি আমাকে বাঙ্গালীর মেয়ের মত দেখাইতেছে কি না।

দেল। এতদিন থাকিয়া আবার বাঙ্গালীর মেয়ে হতে সাধ গেল কেন? (নবাবজাদীর কটীতে হস্ত দিয়া) এরি মধ্যে বাঙ্গালীর মেয়ের কাপড় পরা ভুলে গেলে! খুঁটা যে উল্টা ক'রে গুঁজেছ?

বেগম। তাই ত তোমায় জিজ্ঞাসা করছি, ঠিক হ'লো কি না।

দেল। এই ক দিনেই কি সব ভুলে গেলে?

বেগম। কদিন আর কেমন ক'রে, কয় বছর হ'লো বলো।

দেল। সবে এই এক বছর বই ত নয়।

বেগম। তাই হবে, কার অত ঠিক মনে আছে। বালা তুগাছা দাও দেখি।

দেল। সত্তি সত্তিই যে আবার বাঙ্গালীর মেয়ে সাজছ। কোথাও যাবে নাকি?

বেগম। হাঁ, যাবো।

দেল। আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে?

বেগম। যাবনা কেন, এসনা।

দেল। নবাব সাহেব যদি জানতে পারেন?

বেগম। পাল্লেনই বা, কার মাথা নেবেন?

দেল। তোমার সঙ্গে যাচ্চি তার ভয় কি, তোমার নামে নবাব সাহেবের কাছে খুন মাপ হয়।

বেগম। দেখ দেখি দেলজান আমাকে ঠিক বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ের মত দেখাইতেছে কি না?

দেল। হাঁ হয়েছে, একটু বাকী আছে, চক্ষের সোরমা মুছিয়া ফেল।

বেগম। হাঁ বটেই ত, মূলে ভুল যে।

চক্ষুর সোরমা মুছিয়া উত্তমরূপে বেশভূষা করিয়া নবাবের বেগম যে কেন বহির্দেশে বাহির হইতেছেন, পাঠক! অবিলম্বেই তাহা জানিতে পারিবেন। বেগমের কোনমতে ইচ্ছা ছিল না যে দেলজান সঙ্গে যায় কিন্তু তাহার আগ্রহে স্বীকৃত হইতে হইয়াছিল, অথচ তাহাকে সঙ্গে লইলে ঈপ্সিত কার্য্যের অনেক ব্যাঘাত

হইবার সম্ভাবনা জানিয়া তাহাকে কহিলেন, "দেল! যদি একান্তই যাবে তবে দুইখান ধুতি ও ছড়ি দুইগাছা সঙ্গে লও।"

দেল। কি জন্য?

বেগম। গ্রাম পার হইযাই পুরুষের বেশ ধরিতে হইবে। নতুবা যাইবার সুবিধা ঘটিবে না, পথে অনেক ব্যাঘাত জুটিবে।

দেল। যেখানে যাবে সে কত দূর?

বেগম। অনেক দূর, দুটা বড় বড় মাঠ পার হ'তে হবে।

দেল। তবে আমি যাব না।

বেগম। কেন? এস, একা কেন যাব।

দেল। না তুমি যাও।

বেগম। তবে একখান ধুতি আর ছড়ি এক গাছা দাও।

দেল। কখন ফিরবে?

বেগম। তার ঠিক নাই।

দেল। নবাব সাহেব আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলে কি বল্‌বো?

বেগম। বলো এখনি আস্‌বেন।

এইরূপ ছল অবলম্বন না করিলে, নবাবকামিনী কখন দেলজানকে ছাড়াইতে পারিতেন না। তিনি

শিবির হইতে বাহির হইয়াই বাহিরের একস্থানে ধুতি ও ছড়িটী লুকাইয়া একাকিনী হেমন্তের বাসার দিকে চলিলেন। পটমণ্ডপ হইতে সেই গৃহটী অধিক দূরে ছিল না, অবিলম্বেই তিনি তথায় উপস্থিত হইলেন, তখন হেমন্তকুমার প্রভাবতীর সহিত একাসনে উপবিষ্ট হইয়া কয়েক দিবস পরস্পরে অবরোধ-ক্লেশের কথা কহিতেছিলেন, এমন সময় অনপেক্ষিতরূপে ভদ্র-কুলাঙ্গনার প্রবেশে উভয়ে শশব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, হেমন্ত দণ্ডায়মান হইয়া প্রভাবতীর সহিত একাসনে বসিবার জন্য তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। সেই আগন্তুক স্ত্রীলোক একাসনে উপবেশনের প্রত্যবায় জানাইলে হেমন্তকুমার তাঁহাকে যত্নপূর্ব্বক পৃথক আসন প্রদান করিয়া সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন বেগম সাহেব হেমন্তকুমারকে বসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন এবং কহিলেন, "আপনাদিগকে দেখিয়া অবধি আমি আপনাদের রূপ গুণের একান্ত পক্ষপাতিনী হইয়াছি, যদি নবাব সাহেব আপনাদিগকে অব্যাহতি না দিতেন আমি সাধ্যানুসারে আপনাদিগের পরিত্রাণের উপায় করিতাম, যদি কোন আপত্তি না থাকে তবে আপনাদের পরিচয় প্রার্থনা করি।"

হেম। আপনি কি নবাবের পটমণ্ডপবাসিনী?

বেগম। হাঁ।

হেম। আমার অপরাধ হইয়াছে, আপনাকে চিনিতে পারিতেছিলাম না,—মার্জ্জনা করিবেন। এ স্থান অতি বর্দর্য্য, এখানকার লোকের ব্যবহার অতি কুৎসিত, এখনি একটা অন্যায় কুৎসা করিয়া বিপদে ফেলিয়া দিবে।

বেগম। আপনাদের কোন আশঙ্কা নাই। সেরূপ হইলে, কখন এখানে আসিতাম না। নির্ভয়ে কথা বার্ত্তা কন। আমি থাকিতে আপনাদের কোন বিঘ্ন ঘটিবে না।

হেম। এখানকার লোকের ব্যবহারে ভয় হয়।

বেগম। পুনরায় বলিতেছি, সে বিষয়ে কোন দ্বিধা করিবেন না। আপনার পরিচয় দানের কি কোন বাধা আছে?

হেম। না, আমরা সন্ন্যাসী, যেখানে যখন থাকি, সেই খানেই তখন অবস্থান।

বেগম। আপনার জন্মস্থান কোথায়?

হেম। (কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বনের পর) মুর্শিদাবাদে।

বেগম। পিতা মাতা আছেন কি?

হেম। (মৌনাবলম্বন)

বেগম। যদি বলিবার বাধা থাকে, তবে অনুরোধ করিতে পারি না।

হেম। আপনারা আমাদের জীবন দিয়াছেন, আপনাদের নিকট আমার কোন কথাই গোপন রাখা উচিত নয়।

বেগম। তবে কুণ্ঠিত হইতেছেন কেন?

হেম। হাঁ,—অনেক দিন গৃহত্যাগ করিয়াছি জানি না পিতা মাতা জীবিত আছেন কি না।

বেগম। আপনি যখন সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া আসেন, তখন তাঁহাদিগকে জীবিত দেখিয়া আসিয়াছিলেন কি?

হেম। হাঁ, তখন তাঁহারা বেশ সুস্থস্বচ্ছন্দ ছিলেন।

বেগম। তবে কেন এ নবীন যৌবনে সংসারী না হইয়া যোগী হইলেন?

হেম। সে অতি লজ্জার কথা, বলিতে কুণ্ঠিত হই।

বেগম। আর কি সংসারাশ্রমে প্রত্যাগমন করিবেন না?

হেম। সে বিষয়ে এক প্রতিজ্ঞা আছে।

বেগম। এ স্ত্রীলোকটী আপনার কে?

হেম। ইনি আমার কেহ নহেন, দেবঘরের বনে ইহাঁর সহিত পরিচয়।

বেগম। ইনি কি আপনার স্ব-জাতি?

হেম। হাঁ।

বেগম। কি জন্য বর্দ্ধমান যাইতেছেন?

হেম। বর্দ্ধমান পরগণার কোন পল্লীতে ইহার পিত্রালয়, ইহাঁর নিকট প্রতিশ্রুত আছি, ইহাঁকে জন্ম-ভূমিতে পৌছিয়া দিব।

বেগম। তাহার পরে কি করিবেন?

হেম। কিছু দিন তথায় অবস্থিতি করিয়া তীর্থান্তর যাত্রা করিব।

বেগম। তথাপি সংসারে ফিরিয়া আসিবেন না?

হেম। এরূপ ইচ্ছা বটে, পরে কি হইবে বলিতে পারি না।

বেগম। সংসারী হইলে জন্মভূমিতে প্রত্যাগমন করিবেন কি?

হেম। যদি কখন জন্মভূমি, পিতা, মাতা, বন্ধু, বান্ধব, আত্মীয়, স্বজন এবং তাহাদিগের ভালবাসা ভুলিতে পারি তবেই সংসারী হইব, নতুবা নহে।

বেগম। একি সঙ্গতপর বিবেচনা করেন?

হেম। অসঙ্গত হয়, কখন না ভুলিতে পারি, যেমন আসিয়াছি, ইহলোকলীলা শেষ করিয়া তেমনি তেমনি চলিয়া যাইব।

বেগম। আপনার পিতামাতা কিম্বা আত্মীয়স্বজন কেহ কি আপনার শত্রুতা সাধন করিয়াছেন?

হেম। পুত্র সহস্র অপরাধের অপরাধী হইলেও

কখন পিতামাতা পুত্রের অমঙ্গল কামনা করিতে পারেন না।

বেগম। তবে কি কোন বন্ধু বান্ধবে আপনার শত্রুব কার্য্য করিয়াছে।

হেম। হাঁ, তাই বটে, কোন কাজের বাড়াবাড়ি ভাল নয়, একথা পূর্ব্বে জানিতাম না, কোন একজন আত্মীয় আমাকে অতিশয় ভাল বাসিতেন; তিনিও বুঝিতে পারেন নাই, আমিও পারিতাম না, সেই ভাল-বাসা কাল হইয়া উঠিল, অপর আত্মীযদেব হিংসায পড়িলাম, শেষ সেই ভালবাসাব জন্যই আমাকে সুখের সংসার ছাড়িয়া দিতে হইল।

শেষ কথাটী বলিবার সময় হেমন্ত কুমারের চক্ষু দুইটী অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। হেমন্তের কষ্ট বেগমের সহ্য হইল না, একবারেই বলিয়া ফেলিলেন, আপনার কুসুমকে মনে আছে?

হেম। আপনি কুসুমকে কিরূপে চিনিলেন?

বেগম। এখনও চিনিতে পারিতেছেন না? আর কেন? তবে যোগীব বেশ পরিত্যাগ করুন, পবিত্র সংসার-ধর্ম্মে ব্রতী হউন। হতভাগিনীর অদৃষ্টে যা ঘটিবার ঘটিয়া গিযাছে।

হেমন্তকুমার কিয়ৎক্ষণ গঠিত পুত্তলিব ন্যায় বেগ-মের প্রতি স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। সে সময়ে

তাঁহার মুখের সরলতা, অমায়িকতা যদি কেহ দেখিত, আমরা বলিতে পারি সে নিশ্চয়ই রোদন সম্বরণ করিতে পারিত না। হেমন্তকুমার কথা কহিতে আরম্ভ না করিতে করিতেই বেগম বলিয়া ফেলিলেন ;—"আমিই আপনার সেই কলঙ্কিনী কুসুম, আমিই আপনার সেই সংসার-সুখের প্রতিবাদিনী, শিশুকাল হইতে, যৌবন-কুসুম প্রস্ফুটিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কি দিবা, কি রাত্রি সকল সময়েই আপনার সহগামিনী ছিলাম, আদরের ধন আমিই সেই দুর্ভাগ্যবতী কুসুম। এই পাতকিনী হইতে আপনার সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণের সূত্রপাত, এক মুহূর্ত্তের জন্য যাহাকে চক্ষুর অন্তরাল করিয়া মনোকষ্টে থাকিতেন দাসী সেই পাতকিনী। আহারকালে যে দাসীকে না দেখিতে পাইলে সহস্রবিধ উপাদেয় সামগ্রী ভোজনেও দিবসের অমঙ্গল ভাবিতেন, আমি সেই হেমন্ত প্রাণা অস্পৃশ্যবণিক কন্যা! শৈশবের খেলা,—কৈশোরের আলাপ এখন কি মনে পড়ে? নৈদাঘ মধ্যাহ্নে সেই বকুলের শীতল ছায়ায় উপবেশন, সেই সকল কথা বার্ত্তা; রৌদ্রে তাপিত হইয়া সেই ছায়া-তলে দাসীর ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া নিদ্রা.—তাহার অনতিবিলম্বে সেই স্বপ্ন দর্শন কি এখনও মনে হয়?" এই সকল কথা বলিবার সময় কুসুমের নয়নোৎস হইতে অশ্রুতরঙ্গ প্রবাহিত হইতেছিল।

"কুসুম" নাম শ্রবণ মাত্র হেমন্তকুমার অধীর হইয়া তাহার হস্ত ধরিতে উদ্যত হইলেন এবং কহিলেন, কেও? আমার চিরযত্নের ধন কুসুম! এস নিকটে এস. আমি কি মনুষ্যাধম যে এতক্ষণ চিনিতে পারি নাই। আর কেমন করিয়াই বা চিনিব, আমাকে না দেখিতে পাইয়া তুমি যে এতদিন জীবিত আছ এ আমার মনে ছিল না। তাইত এ যে স্বপ্ন-কল্পিত বোধ হইতেছে, সত্য কি তুমি আমার শৈশব-সহচরী সেই কুসুম? গৃহাশ্রম ত্যাগ করিয়া অবধি যে প্রণয়প্রতিমা কি জাগ্রতে, কি নিদ্রায় নিয়ত চিন্তা করিতেছি, তুমি কি সেই জীবন-সহায় কুসুম? এস নিকটে এস, এই বলিয়া তাহার হস্ত ধরিতে উদ্যত হওয়ায় কুসুম কহিলেন, "আমি আর তোমার স্পর্শ-সুখের অধিকারিণী নহি, এখন আর আমি হিন্দু নাই, যবনকুলে প্রবেশ করিয়াছি,—আমাকে এখন স্পর্শ করিলে ও পবিত্র ব্রাহ্মণ-দেহে পাপ প্রবেশ করিবে। আমি আর সে কুসুম নাই। ক্ষান্ত হও, তোমাকে দেখিয়াই আমার সুখের সাগর উথলিয়া উঠিয়াছে, এ জীবনে যে আর তোমার সাক্ষাৎ পাইব এমন আশা ছিল না। দাসী অনাথিনী, এরূপ সহায়হীনার প্রতি যদি সেই ত্রিলোক-নাথ, অনাথবন্ধু ঈশ্বর না শুভদৃষ্টি করিবেন, তবে এ ত্রিসংসারে আর কে আছে যে তাহাদিগের দুঃখে

কটাক্ষপাত করিবে। আহা! আগেকার কথা মনে হ'লে প্রাণ ফেটে যায়, যত মনে করি সে সকল কথা ভুল্‌বো না, কিন্তু কোথা হ'তে এসে মনে ওঠে। মনে হয় কি? একদিন বৈকালে গঙ্গার তীরে খেলাতে খেলাতে কি বলেছিলে? তখন দুজনেই ছেলেমানুষ, সমাজবন্ধন, সংসারের নিয়ম কেহই জানিতাম না, তাই অত বাড়াবাড়ি হয়েছিল; সে সব কথা মনে হ'লে প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, হৃদয় শূন্য বোধ হয়।" কুসুমের কথা শুনিবার সময় হেমন্ত নীরব ছিলেন মধ্যে মধ্যে এক একটী দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িতেছিলেন, চক্ষু দিয়া দর-দরিত ধারায় বক্ষঃস্থল ভাসিতেছিল।

হেম। তুমি এখন যেই হও তোমাকে স্পর্শ করায় একদিন ভ্রমেও দোষ বিবেচনা করি নাই। ধর্ম্মপক্ষে কোন প্রতিবন্ধক নাই, কাছে এস; তোমার কোরক যৌবনে দেহের যে কৃশতা ছিল তাহা নাই, তরলগৌরব কান্তি যৌবনের সম্পূর্ণতায় ও রাজভোগে রক্তিমাভা ধারণ করিয়াছে, গণ্ডস্থলের স্থূলতায় বালার্ক-ছবি প্রাপ্ত হইয়াছে, সর্ব্বাবয়ব স্ফুর্ত্তি-বিশিষ্ট, দেহের ক্ষীণতা ঘুচিয়া গিয়াছে। চক্ষু দুইটীর সূক্ষ্মতম শিরাগুলি রক্ত-বর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, দৃষ্টির সেরূপ স্থিরতা নাই, যৌবন সুলভ চাঞ্চল্যে সর্ব্বদাই ক্রীড়াপর দেখাইতেছে। সে কালের অঙ্গভঙ্গি কিছুই নাই, কিরূপেই সহজে চিনিব?

বিশেষ যে স্থানে প্রথম সাক্ষাৎ সে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এমন সাধ্য কার? একে মুসলমান জাতি স্বভাবতঃ উগ্রস্বভাবতাময় বঙ্গেশ্বর;—ন্যায় হউক অন্যায় হউক কার সাধ্য কোন কথার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়? এরূপ অপ্রতিহত ক্ষমতাশালী নবাবের অন্তঃপুরাঙ্গনার প্রতি লক্ষ্য করিতে কে সাহসী হইতে পারে?

বেগম। এখনত চিনিতে পারিয়াছ। তুমি বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া সংসার ছাড়িয়া আসিলে আমার মনের অবস্থা কি হইয়াছিল জানি না;—নিয়ত তিন চারি দিন আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া আপন অবস্থার—অতীত ও তৎকালীক বর্ত্তমান ঘটনা সকল চিন্তা করিতে করিতে ভবিষ্যতের ভাবনা আসিয়া জুটিল, ভবিষ্যতের প্রতি যতদূর নজর চলিল নৈরাশ্য বই আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না, তখন যেন মাথা ঘুরিয়া পড়িল, আপনাকে আপনি ভুলিয়া গেলাম, তাহার পর কখন কোথায় কি করিলাম কিছুই মনে নাই। তার কত দিন পরে, তাও বলিতে পারি না, যখন আমার জ্ঞান হইল তখন দিল্লীর সম্রাটের চিকিৎসালয়ে ছিলাম একজন হাকিম চিকিৎসা করিতেন, আর ওমরা কুলবধূ, দুবেলা আসিয়া আমার যত্ন করিতেন, সর্ব্বদা জিজ্ঞাসা করিতেন. "কেমন আছ?" আমি যদি পাগল থাকিতাম ভাল ছিল, চিরদিন পশুর মত কাটা

ইয়া যেতাম, মনে ঘৃণা হ'লো কি করিলাম, মুসলমান হলেম, মুসলমানের ভাত খাইলাম, হায়! শেষে অদৃষ্টে এই ছিল, আত্মহত্যার চেষ্টা করিলাম,—উন্মাদ রোগী, এজন্য রক্ষীগণ পূর্ব্ব হইতেই নিকটে অস্ত্রাদি রাখিতে সাবধান ছিল, কোনমতে ইষ্টসিদ্ধি করিতে পারিলাম। অল্পদিন মধ্যেই বেশ সুস্থ হলেম, কিন্তু মুসলমানই থাকিয়া গেলাম, পুরুষ হইলে কি হইত বলিতে পারি না, আমি ত জাত ফিরিয়া পাইলাম না, এক দিন নবাব কুতুব উদ্দীন আমাকে দেখিতে আসিয়া বলিলেন "তুমি কি বেশ ভাল হয়েছ?" পূর্ব্বে চিত্তের বিকৃতি থাকায় নবাব সাহেবকে লজ্জা করিতাম না। এদিন তাঁহার মুখ পানে চাহিয়া কথা কহিতে পারিলাম না। তিনি ভাবে বুঝিলেন আমার আর চিত্ত বিকার নাই। সেই দিন সন্ধ্যার সময় একজন দাসী আমায় জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি বিবাহ করিবে?" আমি স্বীকৃত হইলাম না, তাহার পরদিন ওমরা সাহেব স্বয়ং আমাকে অনেক বুঝাইলেন আর বলিলেন, তিনিই আমাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহার ধনে, তাঁহার আধিপত্যে কিছুতেই আমার লোভ জন্মাইতে পারে নাই। প্রথমে লোভ, পরে ভয়, শেষে ধর্ম্ম দেখাইয়া বলিতে লাগিল, "আমি তোমার জীবন দিয়াছি, যে অমূল্য জ্ঞান রত্নের জন্য মনুষ্য নামের এত গৌরব, তুমি সে জ্ঞান হারা-

ইয়াছিলে আমি বহু আয়াসে তোমাকে তাহা পুনঃ প্রদান করিয়াছি, তুমি কি কৃতঘ্ন! পরকালের ভয় রাখ না, পবিত্র ধর্ম্মবৃত্তিকে মনোমধ্যে স্থান দাও না? এত উপকার করিলাম ইহার কি এই প্রতিশোধ! এক বার পাগল হইয়া সমস্ত হারাইয়াছিলাম তখন প্রাণের ভয় রাখিলাম না, অকুতোভয়ে উত্তর করিলাম আপনি আমার উপকার করিয়া জীবন দিয়াছেন, আপনার প্রত্যুপকারের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু বিবাহ করিতে পারি না। এই কথায় অনেক ধমকাইল, কোনমতে স্বীকৃত হইলাম না। পরিশেষে যুবন রাজ সুলভ অত্যাচার আরম্ভ করিয়া বলপূর্ব্বক আমার পরকালের পথে কণ্টক দিল। তখন উপায়ান্তর ছিল না। অগত্যা কি করি। এখন যবনহস্তে জাত হারাইয়াছি, কোনমতে তোমার প্রণয় লাভের অধিকারিণী নহি, তবু যে তোমাকে সর্ব্বদা দেখিতে ও ভালবাসিতে কেন ইচ্ছা যায় জানি না।

হেম। আমি তোমার নিকট গুরুতর অপরাধে অপরাধী বাল্যকাল হইতে যখন পরস্পরে ভালবাসা জন্মিয়াছে সে ভালবাসা কখন ভুলিতে পারিব না।

বেগম। তুমি ভুলিতে পারিলে না, কিন্তু আমি আর কোন্ মুখে সে কথা বলিব, বলিবার পথে কাঁটা পড়িয়াছে। তবে এ কথা বলিতে পারি, যে কখন

তোমাকে ও তোমার প্রণয়কে ভুলিতে পারি না। আমার প্রতি তোমার ছেলেবেলার স্নেহ, যত্ন তা কখন ভুলিব না। ভাল খাবার পেলে আমাকে অংশ না দিয়ে আহার করিতে না, দিবাভাগে কি পাঠশালায়, কি গৃহে এবং স্বপ্নেও সর্ব্বদা কাছে রাখিতে, যাহাকে অন্বেষণ করিতে; সে নিকটেই থাকুক আর বহুদূরেই থাকুক, স্বধর্ম্মে থাকুক বা বিধর্ম্মেই থাকুক, মুসলমানই হউক আর চণ্ডালই হউক কিরূপে সে সব কথা ভুলিয়া যাইবে। প্রার্থনা এই যে এখন হইতে যতদিন এ পাপ দেহে জীবন থাকিবে, যেন ততদিন দাসীর হৃদয়ের অভিমত ছবিটী দেখিতে পাই। রাত্রি হইল তোমাদের কষ্ট হইতেছে আহারাদি করিয়া শয়ন কর। কল্য একত্রে বর্দ্ধমান যাওয়া হচ্ছে ত?

হেম। যদিও কয়েক দিন অবরোধে আহারাদির ও শয়নের ক্লেশ হইয়াছিল কিন্তু তোমাকে দেখিয়া আমার সে সমস্তই দূর হইয়াছে। ফাঁড়িদার পরম শত্রু হইলেও এখন বোধ হইতেছে, পরম বন্ধুর কার্য্য করিয়াছে। আর যে ছেলেবেলার কথা, সেই ভালবাসার কথা বলিলে, সে সব স্বপ্নের মত বোধ হইতেছে, তুমি এখন নবাবের বেগম, সে সকল কথা বলা অন্তরে থাকুক, মনে করিতে শঙ্কা হয়, চতুর্দ্দিকে অগণন যবনসেনা একথা শুনিলে দরিদ্র ব্রাহ্মণের জীবনে আঘাত লাগিতে

পারে। নতুবা দরবারে থাকিবার সময় যখন অনুকুল দৃষ্টি, মুখ ভঙ্গিতে পরিচিতের ন্যায় ভাব দেখাইতেছিলে তখন তদ্রূপে তাহার উপযুক্ত উত্তর পাইতে না, বঙ্গে এখন যবন সাক্ষাৎ কৃতান্ত, যবনের নামে বঙ্গবাসীর অঙ্গ শিহরিয়া উঠে, বঙ্গে আজি কালি যবন একচ্ছত্রি, যবনের মুখের উপর কথা কহিতে কাহারও সাহস নাই।

বেগম। কি বলিলে? একথা শুনিলে যে রাগে শরীর জ্বলিয়া উঠে, দাসী যে কাজ করিবে নবাব দরবারে এমন লোক কে আছে যে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করে? স্বয়ং নবাবেরও তাহাতে দ্বিরুক্তি করিবার ক্ষমতা নাই, একেত হিন্দুকুলে জন্মিয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি, তাহাতে যদি নিতান্ত হীনাবস্থায় থাকিব, যেখানে থাকিব সেখানে প্রাধান্য না থাকিবে বা কর্ত্তৃত্ব না চলিবে, তবে যে আত্মঘাতী হওয়া ভাল নবাবদিগের বিলাসের জন্য সহস্রাধিক বারবনিতা থাকে যদি সেইরূপই হইতাম, কিছুমাত্র স্বাধীনতা না থাকিত তবে যদৃচ্ছা এস্থানে বসিয়া এত দীর্ঘকাল কাটাইতে পারিতাম না, এরূপ আধিপত্য থাকিলেও নবাবের বেগম বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ হয়, তুমি ওকথা বলিলে মর্ম্মে বড় ব্যথা লাগে।

হেম। আমার ভ্রম। আমার মনে ছিল না যে প্রমত্ত হস্তীও সামান্য অঙ্কুশকে ভয় করে, ভ্রমর সকল

পুষ্পের স্বামী হইলেও তাহাকে কেতকী-কণ্টকে ভয় করিতে হয়। রাত্রি অধিক হয়, এখানে ত থাকবে না তবে এস।

বেগম। মনে কল্লে কি থাক্‌তে পারি না? তবে থাক্‌বো।

হেম। এক রাত্রির জন্য লোক জানাজানিতে আর কাজ কি?

বেগম। লোক জানাজানিতে আমি ভয় করি না, এই থাকিলাম।

হেম। না;—না; আজ এস আবার কাল দেখা হবে।

বেগম। এখানে তোমার থাকিবার কোন কষ্ট না হয় ত যাই, না হলে থাকি।

হেম। না, নবাব সাহেব যা বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন ইহাতে কোন কষ্ট হইবে না।

বেগম। তবে আসি।

হেম। এস।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

—※—

কর্ত্তর্জ্জনা।

হেমন্ত প্রভাবতী সহ সুখে সে রাত্রি যাপন করিলেন, সে দিন কোন নূতন বিপদ আর ঘটিল না। সুখের নিদ্রায় রাত্রি অবসান হইল, ভোর হইয়াছে, পাখী সকল বাসায় বসিয়া কলরব করিতেছে, রাত্রির অন্ধকার ঘুচিয়া বেশ ফরসা হয় নাই; এমন সময় নবাবের জনৈক ভৃত্য আসিয়া তাঁহাদিগকে জাগ্রত করিল এবং কহিল বর্দ্ধমান যাইবার সমস্ত আয়োজন ঠিক হইয়াছে আপনারা আসুন। হেমন্ত ও প্রভাবতী ব্যস্ত সমস্ত হইয়া শয্যা ত্যাগ করিলেন। পথে অনেক ভয়; স্ত্রীলোক লইয়া বর্দ্ধমানের দুর্গম পথে গমন করায় অনেক বিঘ্ন, নবাবের সঙ্গে অনেক লোকজন আছে, একত্র যাইলে কোন কষ্ট হইবে না, বিশেষ নবাব যখন বিনা প্রার্থনায় এত অনুগ্রহ করিতেছেন, তখন অনেক রকমে সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে,

মন কি বর্দ্ধমান হইতে আলাটী বমুলপুব অনূ্যন বার ক্রোশ, যদি কোন সুবিধা আবশ্যক হয় পাওযা যাইতে পাবিবে। তাঁহাবা দুইটীতে কপোতযুগলের ন্যায় গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, বাহিরে দেখেন ভৃত্যেব হস্তে একটী আলো আছে, পাছে পথের বন্ধুবতায গমনের কষ্ট হয় এজন্য নবাব সাহেব স্বযং সেই ব্যবস্থা কবিয়া দিযাছেন, সেথান হইতে পটমণ্ডপ অধিক দুব নয়, তাঁহাবা সেই মুহুর্ত্তেই নবাব সকাশে উপস্থিত হইলেন। নবাব তাহাদিগকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা কবিলেন, "কেমন! কল্য রাত্রে তোমাদেব ত কোন কষ্ট হয় নাই?" হেমন্ত স্বভাবতই শিষ্ট, মিষ্টভাষী নম্র বচনে কহিলেন, "আজ্ঞে না! হুজুবেব অনুগ্রহে আমরা সুখে বাত্রি যাপন কবিয়াছি।" তাঁহাদের পৌছিবাব পূর্ব্বে মুসলমানকুলপতি কুতব উদ্দীন হেমন্তের জন্য একটা হস্তী এবং প্রভাবতীব জন্য এক খানি পাল্কী নির্দ্দিষ্ট কবিয়া বাখিয়াছিলেন। তাঁহাবা আসিয়া মিলিত হইলে নবাব ছাউনি তুলিয়া বর্দ্ধমানে যাইবাব জন্য সকলকে আদেশ দিলেন। নলিনী নিশাকালে আপন পতিকে দেখিতে পায় না সেই খেদে সমস্ত বাত্রি অন্য কোন বস্তু দেখে না, চক্ষু মুদিত কবিয়া থাকে, কিন্তু পতিব আগমনে সমস্ত দিবা পতিব কর বক্ষে ধবিয়া অনিমিষ চক্ষে আকাশ পানে চাহিয়া থাকে; স ভা-

বের অভাব কুত্রাপি দেখা যায় না; তাই বেগম সাহেব হেমন্তকে পাইয়া সমস্ত পথ আপন পাল্কীর দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া হস্তী পৃষ্ঠে হেমন্তকে দেখিতে দেখিতে চলিলেন।

ক্রমে বেলা অবসান হইল, সূর্য্যকর এত গরম হইয়া উঠিল যে, আর সহ্য হয় না, পদে পদ বিক্ষেপে ক্লেশ অনুভূত হইতে লাগিল, গগনমণ্ডল রৌদ্রবর্ণে রঞ্জিত হইয়া উগ্র মূর্ত্তি ধারণ করিল, পক্ষীগণ বৃক্ষের নিবিড় পত্রসঙ্কুল শাখায় আশ্রয় হইল, প্রান্তর মধ্যে দিনকর কররচিত মরীচিকা খেলা করিতে আরম্ভ করিল, পথিকেরা স্নান ভোজনের জন্য আশ্রয় চেষ্টা করিতে লাগিল। এমন সময় বঙ্গেশ্বর কুতুব সা সদলে কর্জ্জনা নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এ দিবস এই স্থানেই ছাউনি করিয়া থাকিবার জন্য নবাব বাহাদুরের আদেশ হইল। তদনুসারে সকলেই গমনে ক্ষান্ত হইলেন; ভৃত্যগণ যথাস্থানে পটগৃহ স্থাপন করিল; নবাব কুতব উদ্দীন স্নান, তৎপরে আহার, আহারের পর বিশ্রাম করিলেন; যদিও রাজকার্য্য ছিল কিন্তু সে দিন আর সে সকল কিছু না করিয়া হেমন্তকুমারকে ডাকাইলেন। নবাব ডাকিতেছেন শুনিয়া হেমন্ত কুমার অবিলম্বে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন, তিনি আসিবামাত্র নবাব তাঁহাকে আসন গ্রহণে অনুমতি

করিলেন, নির্জ্জন স্থান, সেখানে নবাব ও হেমন্ত কুমার বই কেহ ছিল না, দূরে বক্ষীবর্গ সশস্ত্রে বেড়াইতেছিল। নবাব গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি?

হেম। হেমন্তকুমার।

নবাব। কোথায় নিবাস?

হেম। মুর্শিদাবাদ।

নবাব। তুমি মুর্শিদাবাদের কাহার পুত্র?

হেম। (হেঁট মুখে অবস্থান)

নবাব। আমি তোমার ভাব ভঙ্গীতে তোমাকে শিষ্ট শান্ত এবং অকপট বলিয়া জানিতে পারিয়াছি, আমার নিকট তোমার কোন বিষয় গোপন রাখা কর্ত্তব্য হয় না। যখনই তোমাদের দুই জনকে দেখিয়াছি তখন হইতে আমার মনে স্বভাবতঃ কেন এত স্নেহের উদয় হইয়াছে তাহা জানিনা। ইচ্ছা হয় সর্ব্বদাই তোমাদিগকে দেখি। তুমি নির্ভয়ে সমস্ত কথা আমাকে খুলিয়া বল, আমি তোমাকে আমার দরবারের কোন প্রধান সচীবের পদ প্রদান করিব।

হেম। এক্ষণে আমি সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী, বিষয় লালসায় আর আমাকে ভুলাইতে পারিবে না। মহাত্মন্! আমার প্রভুত ঐশ্বর্য্য ও অতুলসম্পদ ছিল, সে সমস্তই ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। তবে আপনি

বঙ্গদেশ মধ্যে সকলের একমাত্র প্রভু। আপনি যখন এত অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন তখন আপনার অনিচ্ছায় কোন কাজ করা অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিতেছি আমি বলিতেছি আত্ম-বিবরণ বলিতে কিছুই গোপন করিব না।

নবাব। তোমার পিতার নাম কি?

হেম। আপনাকে বলিতে কোন বাধা মনে করি না, কিন্তু সন্দেহ হয় পাছে কোন বিঘ্ন ঘটে, আমি সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছি, পিতা মাতা জীবিত আছেন, জানি কি যদি অভিপ্রেত কার্য্যে কোন অন্তরায় ঘটে।

নবাব। তোমার সে ভয়ের কোন কারণ নাই

হেম। আমার পিতার নাম দিননাথ মুখোপাধ্যায়।

নবাব। তুমি কি নিশ্চয়ই সংসারাশ্রমে ফিরিবে না? এই মাত্র যৌবন-কুসুম মুকুলিত হইয়াছে এমন কোরকাবস্থাতেই কি কীট দ্বারা তাহা নষ্ট করিবে স্থির করিয়াছ?

হেম। মনুষ্যজীবন অতিবাহনের দুইটী পন্থা আছে, এক সংসারে থাকিয়া ভূলোক দেবতা পিতা মাতার সেবা শুশ্রূষা ও পুত্রকলত্রদিগের লালন পালন করিয়া বার্দ্ধক্যে পরকালের সম্বল একমাত্র সেই ঈশ্বরের ধ্যানে সময়াতিপাত করা, আর একটী এই যে জ্ঞানো-

দয় অবধি কেবলমাত্র সেই পরাৎপর পিতার নাম ধ্যান করিয়া সমস্ত জীবন ক্ষেপণ করা।

নবাব। সে কথা সত্য। কিন্তু জান যে সংসারী হইয়া ধর্ম্মপথে চলিলে তাহা অপেক্ষা পুণ্য আর নাই। মনুষ্য সংসারাশ্রম গ্রহণ করে ইহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত। সংসারে অনেক সুখ ও সম্পদের পথ আছে।

হেম। সত্য বটে কিন্তু সেই সুখ ও সেই সম্পদ লাভ করিবার তরে কত বিপদ ভোগ করিতে হয়?

নবাব। তা জান না, অমাবস্যার অন্ধকার না থাকিলে কি পৌর্ণমাসীতে আনন্দ বোধ হইত? রাত্রির অন্ধকার না থাকিলে কি দিবসের আলোকে চক্ষুর প্রীতি জন্মিত? দুঃসহ গ্রীষ্ম জ্বালা না থাকিলে কি মলয়ানিল সুখকর হইত?

হেম। তা বলিয়া কি সুদীর্ঘ প্রান্তরে পড়িয়া প্রচণ্ড দিনকর তাপে তাপিত হইলে ভয়ঙ্কর বিষধরের ফণার ছায়ায় আশ্রয় লওয়া কর্ত্তব্য?

নবাব। সাবধানতা অবলম্বন করিলে বিচক্ষণ ব্যক্তিরা নিরাপদে এই ভূমণ্ডলে বিচরণ করিতে সমর্থ হন।

হেম। তবে সাধারণ ব্যক্তি মাত্রের লীলাস্থল এই সংসার ভূমি সুখের নহে?

নবাব। সে কথা কিরূপে বলিব। এই সংসার

ক্ষেত্রের কোথাও অতি বিস্তীর্ণ উর্ম্মীমতী তটিনীকুল বিকটভঙ্গীতে মনুষ্যদিগের আতঙ্ক জন্মাইতেছে; কোথাও রক্ত-পিপাসু হিংস্র জন্তুদিগের বিহারভূমি দুর্গম কান্তার, কোথাও তরুগুল্মহীন বালুকাপূর্ণ অপার মরুভূমি, কোথাও দুরারোহ বন্ধুর পর্ব্বতশ্রেণী, এই সকল বাধা অতিক্রম করা মূঢ় জনের সাধ্য নহে। তোমার কথা বার্ত্তায় তোমাকে বেশ বিচক্ষণ ও বিবেচক বলিয়া বোধ হইতেছে তুমি সংসারে প্রবেশ করিলে অনায়াসে সেই সকল প্রতিবন্ধক হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে।

হেম। তবে যে পথে কোন ভয় নাই, কি জ্ঞানী কি অজ্ঞানী সকলেই তুল্যরূপে যে পথের পথিক হইতে পারে; যে পথে সুখের আশা দুঃখের ভয় নাই সে পথ অবলম্বন করাই ত উচিত?

নবাব। আমি তর্ক দ্বারা তোমাকে পরাজিত করিতে ইচ্ছা করি না; তোমার পিতা নবাব সরকারের একজন জানা লোক; যাহাতে তোমার অসুখ হইবে তাহা দেখিতে বা শুনিতে আমার কষ্ট বোধ হয়, এখন বর্দ্ধমান চল।

হেম। সে কথায় ত অসম্মত করিতেছি না; আপনি আমার জীবনদাতা, যা বলিবেন তাই করিতে প্রস্তুত আছি, তবে তর্কস্থলে উচিত কথা বলিতে ছাড়িব না।

হেমন্তকুমার নবাব সাহেবের শুভদৃষ্টিতে পড়িয়াছিলেন, হেমন্ত যা বলিতেন নবাব সাহেব তাই শুনিতেন, তিনি হেমন্তের নিতান্ত পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। এককালে অতিরিক্ত স্নেহ না জন্মিলে আর কখন এত দূর হয় না। কেন যে বঙ্গেশ্বর এই ব্রাহ্মণ কুমারের প্রতি এতাদৃশ অনুরক্ত এ কথা। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তাহার পরদিবস বর্দ্ধমান পৌঁছিতে তাঁহাদিগের অধিক বেলা হইল না। নবাব সাহেবের অনুচরবর্গ বর্দ্ধমান পৌঁছিলে তদানীন্তন পাঠান রাজকর্ম্মচারী সের খাঁ কর্ত্তৃক রীতিমত অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হয় নাই। মহাত্মা আকবর সাহেব মৃত্যু সংবাদ সের আফগান যে দিন শুনিয়াছিলেন তিনি সেই দিনই জানিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহার বিপদ অতি নিকট, কুমার জাহাঙ্গীর কর্ত্তৃক তাঁহার জীবন সম্বন্ধেই বিনাশ হইবার চেষ্টা হইবে তাহা তিনি পূর্ব্বেই অবগত ছিলেন। বিশেষতঃ কুমার সেলিমের সিংহাসনাধিরোহণের অত্যল্প দিন পরেই যখন রাজা মানসিংহ দীল্লিতে যাইবার জন্য আহূত হয়েন তখন তাঁহার সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হইয়াছিল। তাহার পরই আবার অভিনব নবাবের বর্দ্ধমান পরিদর্শন, এই সকল বিশেষ কারণ ব্যতীত, সঙ্ঘটিত হওয়াতে তিনি এককালে বিরক্ত হইয়াছিলেন। সের আফগান যে একজন প্রকৃত বীরপুরুষ ছিলেন তাহা

বঙ্গদেশের ইতিহাস পাঠে বিশেষ অবগত হওয়া যায়। বীর পুরুষদিগের পক্ষে ভীরুতা সাক্ষাৎ বিষস্বরূপ,— প্রাণান্তেও তাঁহারা চাটুকারিতার সাহায্য গ্রহণে ইচ্ছা করেন না। সে জন্যই সের আফগান কর্ত্তৃক নবাবের অভিনন্দন প্রদত্ত হয় নাই।

নবাব সাহেবের দল বল বর্দ্ধমান পৌছিলে, তাঁহারা সকলেই আপনারা আপন আপন বন্দোবস্ত করিয়া লইল। সবে মাত্র আজি বর্দ্ধমানে নূতন আগমন, সমস্ত ঠিকঠাক করিয়া হেমন্ত প্রভাবতীর আহারাদি করিতে বেলা অপরাহ্ণ হইয়াছিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে হেমন্তকুমার কুতুব সাহেব সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার শিবিরে গমন করিলেন, প্রভাবতী একাকিনী সেই জনশূন্য উদ্যানে বসিলেন, নিকটে একটী মাত্র পরিচারিকা সেও বিশেষ পরিচিতা নহে। নবাব সরকার হইতে তাঁহাদিগের পরিচর্য্যার জন্য নূতন নিযুক্ত, তাহার সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত সুতরাং তাহার সহিত যে দু একটা মনের কথা কহিয়া কিয়ৎকাল কাটাইবেন তাহারও উপায় ছিল না। তখন চিন্তা আসিয়া প্রভাবতীর মনে বিহার করিতে লাগিল। এই বেলাবসান সময়ে, এই জনশূন্য উদ্যান মধ্যে বসিয়া প্রভাবতী কি যে ভাবিতে ছিলেন, সে কথা তিনি আমাদিগকে প্রকাশ করিয়া না বলিলেও তাঁহার মুখশ্রী

দেখিয়া স্পষ্ট জানিতে পারা গিয়াছিল। এখন দেখিতে গেলে প্রভাবতীর সুখের দশা,—আজি কালি আর সে প্রভাবতী নাই, আর সেই সন্ন্যাসী আশ্রমে তাঁহার অবরোধের দশা নাই, সমস্ত দিন অনশনে সন্ন্যাসী-দিগের সেবার জন্য বিজন অরণ্যে আর তাঁহাকে ভ্রমণ করিতে হয় না, এ আর নিগোনের সবাই নহে যে গ্রামবাসীদিগের ষড়যন্ত্রকে ভয় করিতে হইবে। বনের অবিচ্ছেদী যাতনা, সেখান হইতে পলায়নের পর দিন দিন অভিনব বিপৎপাতের আশঙ্কা, সে সকল কিছুই ছিল না। মানবমন সদাই অপরিতৃপ্ত, অবস্থার পরিবর্ত্তন কামনা মানবমনের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম, দুঃখের দশায় সুখের প্রত্যাশা, সুখাগমে তাহার ক্রমোন্নতির চেষ্টা কিছুতেই নিবৃত্ত হইবার নহে। প্রভাবতী ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে উদ্যান তরুশিরে সমীরণ সহ প্রাচীন সূর্য্যরশ্মির ক্রীড়া দেখিতেছিলেন, কিন্তু মন অন্য দিকে নিয়োজিত ছিল, তাই অকস্মাৎ কোকিল কুজনে, পাপিয়ার উচ্চরবে, এক একবার চমকিয়া উঠিতে ছিলেন, প্রকৃতির সায়ংকালীন মনোজ্ঞ চিত্রখানি তাঁহার চক্ষের উপর নাচিয়া বেড়া-ইতে ছিল, কিন্তু কোনমতে তাঁহার চিত্তকে স্বাভিমুখে আকর্ষণ করিতে পারিলেন না। দৃষ্টির স্থিরতা দেখিলে হঠাৎ বোধ হয় যেন তিনি সুমন্দ মলয়মারুৎচালিত বৃক্ষপত্রের মৃদুসঞ্চালন, বিহঙ্গমদিগের সানন্দ নর্ত্তন,

সম্মুখবর্ত্তী সরোবরের তরঙ্গক্রীড়া অবলোকন করিতে- ছিলেন, কিন্তু তাহা হইলে তাঁহার সুচারু ললাটফলকে কেশবিন্যাসের নিম্নে মুক্তাকলাপ গ্রথিত, সীমন্তভূনার ন্যায় ঘর্ম্মবিন্দু কেন? কেনই বা এই শান্তিদায়িনী সন্ধ্যা সময়ের সমীরণ সেবায় তাহা বিলীন হইতেছে না, মধ্যে মধ্যে অধরোষ্ঠ কম্পন এবং শরীরের রোমাঞ্চই বা কেন? প্রভাবতী কিছুই দেখেন না, কিছুই শুনেন না, চিন্তা করিতেছিলেন। ক্ষণেক পরে তাঁহার গোলাপসন্নিভ সরস ওষ্ঠাধরে একটুকু হাসি দেখা দিল প্রভাবতী নীচ গলায় এই গানটী গাইলেন,—

রাগিণী পিলু।—তাল যৎ।

কি ক্ষণে হেরিনু, সেই বিজন বিপিনে,
সুচারু চিকণ কান্তি রমণী রঞ্জনে,
অধরে মধুর হাসি, যেন কৌমুদীর রাশি,
ভুলাইল কাছে আসি, অমিয় বচনে,
কি রূপ হেরিল আঁখি, সদা ইচ্ছা তাই দেখি,
যতনে হৃদয়ে রাখি, সে বিধুবদনে।

এই গানটী দুইবার গাইতে গাইতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল, আকাশ অবনী ধূসর বসন পরিধান করিল, জগৎ শীতলতা প্রাপ্ত হইল, কেবল বিরহীদিগের অন্ত-

রের উষ্ণতা হ্রাস হইল না, ববং কুসুমসৌরভে স্নিগ্ধ অনিলসেবনে, কোকিলকুলের অবিশ্রান্ত কুহুরবে শরীর জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। প্রভাবতী বামাস্বরে গীতটী পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতে ছিলেন, এমন সময় হেমন্ত প্রত্যাগত হইয়া তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া একমনে গানটী শুনিতে ছিলেন, ক্রমে রাত্রির অন্ধকারে আর কিছু দেখা গেল না। তখন প্রভাবতীর মনে হইল, রাত্রি হইয়াছে, শশব্যস্তে যেমন গৃহ প্রবেশ করিতে যাইবেন দেখেন হেমন্ত দণ্ডায়মান!

হেম। বেশ গাইতে পার এই যে?

প্রভা। কে গাইতে পারে?

হেম। তুমি!

প্রভা। কই? না,—

হেম। (চিবুকে হস্ত দিয়া) তবে বুঝি কোন অপ্সরা!

প্রভা। তা হ'লে অপ্সরার অপমান হয়?

হেম। আপনা হ'তে ধরা দিলে।

প্রভা। আমি কি অপ্সরা?

হেম। অপ্সরা কোন ছার।

প্রভা। কে বলে?

হেম। যে দেখে।

প্রভা। কেউ ত তেমন দেখে না।

হেম। দেখে বই কি, মনে কি জান্‌তে পার না ?

প্রভা। নিগোনের কথা মনে আছে কি ?

হেম। আছে বই কি।

প্রভা। ভুলবে না ত ?

হেম। প্রাণ থাক্‌তে ত আর নয়।

প্রভা। তবে দেখ্‌তে পাব। বঙ্গেশ্বরের সঙ্গে কি কথা হ'লো ?

হেম। হ'লো।

প্রভা। কি কথা বার্ত্তা হ'লো ?

হেম। বলিলেন, "তুমি প্রধান সচীবের পদ গ্রহন কর, যাহাতে রাজকার্য্য সুচারুরূপে চলে তাহার ব্যবস্থা কর। সর্ব্বদা আমার নিকট থাক তোমার উপর সমস্ত ভার দিলাম। ইত্যাদি।"

প্রভা। রাজানুগ্রহ লাভ কম সৌভাগ্যের কথা নহে। এই অযাচিত রাজনিয়োগ স্বীকার কর।

হেম। পিতৃভবন দর্শনের আগ্রহ এত শিথিল হ'য়ে এল কেন ?

প্রভা। যখন সমস্ত আপদ বিপদ পার করিয়া আসিয়াছি, তখন পিতৃভবন দর্শনের আর সন্দেহ করি না।

হেম। পিতা মাতার প্রতি এত ভক্তি, এত যত্ন, আত্মীয় স্বজনদিগের সাক্ষাৎ লাভে এত ঔৎসুক্য, শরতের মেঘের মত সব একবারে নিবিয়া গেল যে ?

প্রভা। মাতা পিতার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা কোন মতে অন্তর্হিত হইবার নহে। আত্মীয় স্বজনের দর্শন লাভেও আগ্রহ আছে, কিন্তু এই কোন একজন অজ্ঞাত কুলশীল অপর ব্যক্তির নিকট আছি?

হেম। এর মধ্যে কিসে আপনার বলে জান্‌লে?

প্রভা। মনে,—

হেম। জগতের লোকের মন যা জানে, যা বলে তা কি ঠিক হয়?

প্রভা। প্রায়ই হয়।

হেম। সর্ব্বত্র নয়?

প্রভা। না,—কিন্তু কাজে জানা যায়।

হেম। আমার কি?

প্রভা। দিবাকর যে নলিনীবান্ধব এ কথা কে জানিত, যদি না সরোজিনী প্রভাতে প্রমোদিনী এবং প্রদোষে প্রমুদিতা হইত।

হেম। কিন্তু দিবাকর যে নলিনীতে অনুরক্ত, তাহার প্রমাণ?

প্রভা। নিশান্তে প্রণয়িণীকে তাহার দর্শন দান।

হেম। তাহার কি অন্য কারণ নাই?

প্রভা। না অন্য কোন কারণ নাই।

হেম। তবে কেন এত ভালবাসার ধনকে রাত্রি-কালে যাতনা দেয়?

প্রভা। স্বেচ্ছায় নহে; স্বভাবের নিয়ম বশে সায়ংকালে দিবাকরের মলিনমুখ দেখে কে না সে কথা স্বীকার করবে? নির্গোনের পৃথক কারাগৃহ কাহার ইচ্ছা ছিল কি?

হেম। না।

প্রভা। এতেও আপনার বলে জানতে পারবেনা?

হেম। দোষ স্বীকার করি। এতক্ষণ কি ভাবছিলে?

প্রভা। যা না ভেবে থাক্‌তে পারি না।

হেম। একি নূতন চিন্তা?

প্রভা। নূতন কেন?

হেম। পুরাতনের মধ্যে সকলি তজানি।

প্রভা। সেটী কেবল জান না।

হেম। জানতে পারবো বোধ হয়?

প্রভা। মনে যদি জানতে পেরে থাক।

হেম। তবে বলবে না?

প্রভা। না,—

হেম। তা হ'লে আর ভালবাসা কিসের?

প্রভা। আমার ভালবাসা কি কল্পনা কর?

হেম। কবি বই কি।

প্রভা। কুসুমের মর্ত কি?

হেম। সে পৃথক্‌ কথা।

হেম। তাহাকে যেরূপে ভালবাসি আর কাহাকেও সেরূপে ভালবাসিতে চাহি না।

প্রভা। কুসুমকে দেখে সব ভুলে গেলে নাকি?

হেম। কেন?

প্রভা। তা বই কি। এতদিন কি এমন ছিলে।

হেম। সে কেবল তোমার ভালর জন্য;—না হ'লে তোমাকে বিবাহ করিব একদিনও মনে করি না। কথায় যত বলিয়াছি মনে কখন তত করি না।

এই কথায় প্রভাবতীর মুখ মলিন হইয়া আসিল; সমস্ত শরীর যেন শুকাইয়া গেল, থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। প্রভাবতী ভূতলে পতিত হইলেন। অনেকক্ষণ পরে প্রভাবতীর চেতনা সঞ্চার হইল, দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন,—"যদি এমনই মনে ছিল তবে কেন আমাকে উদ্ধার করিয়া আনিলে? কেনই বা এত বিপদ ভোগ করিয়া হতভাগিনীর অসার জীবনের যন্ত্রণা বাড়াইলে? তোমার মনে যে পরিণামে এই ছিল আমি তাহা স্বপ্নেও জানি না। এই দুঃখপূর্ণ অন্ধকারময় সংসার-কারাগারে কেন আর থাকি? ছাড়িয়া দাও এখন আমার আত্মঘাতিনী হওয়াই শ্রেয়ঃ, হায়! সংসারের কুটিল গতি বুঝিয়া উঠা ভার! দূর হইতে সংসার-কানের মনোহারিতা দেখিয়া, কুসুমনিচয়ের সৌরভামোদে মত্ত হইয়া,

সংসারের অশেষ সুখ কল্পনায়, সেই দিকে অগ্রসর হইতে ছিলাম, কিন্তু তাহার মধ্যে যে প্রবল শত্রু শ্বাপদ সদা শোণিততৃষায় লোলজিহ্বা বিস্তার করিয়া ভ্রমণ করিতেছে একথা পূর্ব্বে জানিতাম না। হা! ঈশ্বর শেষে এই হইল।”

হেম। (স্বগত) কুসুমের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে অন্য কাহারও প্রণয়ে মগ্ন হইব না, কিন্তু সে এখন যবনী, এক্ষণে প্রভাবতী আমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী যদি এখন প্রভাবতীর পাণিগ্রহণে অমত করি তবে স্ত্রীহত্যার পাতকী হতে হবে। (প্রকাশ্যে) যদি তুমি একান্ত আমার প্রতি অনুরক্তা হইয়াছ তবে অগত্যা সম্মত হইলাম।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

কামনা সিদ্ধ।

সের আফগানের সহিত যুদ্ধে কুতুব সা নিধন প্রাপ্ত হইলে নবাব শিবিরে শোকের তমোময়ী মূর্ত্তি বিচরণ করিতেছিল,—সকলেই বিমর্ষ, সকলেরই মুখ প্রতিভাশূন্য।—নবাবসরকারে কুসুমের বেশ প্রতিষ্ঠা ছিল, তিনি যাহার আদরে আদরিণী, সেই কুতুব সা আজি

সমবয়স্কা, এখন আর তাঁহার সেরূপ ক্ষমতা নাই; কিন্তু কুসুমের আপনার উপর প্রভুত্ব বৃদ্ধি হইয়া ছিল, আজি কুসুম সম্পূর্ণ স্বাধীন ও পরাধীনতার গুরুশৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। যে দিন কুতুব সা শত্রু হস্তে জীবন সমর্পণ করেন ঠিক সেই দিন নিশীথ সময়ে তিনি হেমন্তের বাসভবনের দিকে আসিতেছিলেন, রাত্রি দুই প্রহর,—সমস্ত পৃথিবী নীরব; কুসুম নির্জ্জন পথে উদ্যান প্রবেশ করিলেন, আজি কুতব সা গতাসু; সচ্ছন্দে মনের সুখে হেমন্তের নিকট অতীত দুঃখের বর্ণনা করিবেন তাঁহার এই ইচ্ছা, আর একটী অভি-প্রায় তদীয় অন্তঃকরণের অধঃস্থলে নিহিত ছিল;—যে হেতু সে হেমন্তকে অত্যন্ত ভাল বাসিত, এখন যদিও কুসুম বিজাতীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে, তথাচ তা-হার হৃদয় হইতে হেমন্ত অন্তর্হিত হয় নাই, এখন হেম-ন্তের সুখে সে সুখী, এখনও হেমন্তের কষ্ট দেখিলে তাহার অন্তর কাঁদে। এখন হেমন্ত যাহাতে সন্ন্যাসীবেশ ত্যাগ করিয়া গৃহবাসী হয় ইহাই তাহার চেষ্টা। তাহার মনের উপাসনা একবারে নির্ম্মূল হইয়াছে, কাজেই প্রভাবতীর সহিত শুভ সংমিলন ইচ্ছায় কুসুম আজ হেমন্তের বাসার দিকে গমন করিতেছে। ক্রমে নির্দ্দিষ্ট গৃহের বাতায়ন সমীপে উপস্থিত হইলেন, তখনও সে ঘরে সন্ধ্যার দীপ নির্ব্বাণ হয় না। দীপালোক ক্ষীণাকারে মিট মিট

করিয়া জ্বলিতেছিল; অস্পষ্টরূপে দুইটী মূর্ত্তি দেখা যাইতেছিল; তাঁহারা নিদ্রিত নহেন, পরস্পরে কথা-বার্ত্তা কহিতেছিলেন। দেখিয়া শুনিয়া কুসুম মনে অত্যন্ত আহ্লাদ জন্মিল। প্রভাবতী মূর্ত্তিমতী সরলতা; হেমন্তকুমারকে মনের দ্বার খুলিয়া অনেকগুলি কথা বলিলেন, কুসুম মৃদুস্বরে এই কথাগুলি শুনিতে পাইলেন।

প্রভা। নিতান্তই কি আমাকে ছাড়িলে?

হেম। ছাড়িব কেন? যত দিন বাঁচিব তোমাকে মনে রাখিব।

প্রভা। তবে এখনকার মত আর তোমাকে যখন তখন দেখিতে পাইব না?

হেম। কেন? সর্ব্বদাই দেখিতে পাইবে।

প্রভা। আমার ইচ্ছা যায় তোমাকে সারাদিন দেখি

হেম। আমি সন্ন্যাসী বেশত্যাগ করিয়া স্বইচ্ছায় তোমার নয়ন পথিক হইব।

প্রভা। ঈশ্বর এরূপ দিন কি দিবেন?

হেম। দেখ। আমি তোমার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলাম; আজিও আছি; কিন্তু তোমায় বিবাহ করিতে পারিব না কেন?

প্রভা। কুসুমের প্রতি তোমার কি কোন আশা আছে?

হেম। সে ত মুসলমানী।

প্রভা। তবে এ দাসীকে গ্রহণ করিতে কোন আপত্তি ঘটাবেন না ?

এই কথাটী বলিয়া প্রভাবতী উপাধানে মুখ ঢাকিয়া রহিলেন, অপর কোন কথা কহিলেন না, থাকিয়া থাকিয়া এক একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িতে লাগিলেন, কুসুম বহির্দ্দেশ হইতে তাহা শুনিতে পাইয়া জানিলেন প্রভাবতী রোদন করিতেছেন। কুসুম অনেকক্ষণ গবাক্ষ পার্শে দাঁড়াইয়া রহিলেন, আর কোন কথা শুনিতে পাইলেন না। ক্রমে পূর্ব্বদিকে শুক্র তারার উদয় হইল, রাত্রির অন্ধকার ঘুচিয়া একটু ফরসা হইল। রাত্রি শেষ দেখিয়া কুসুম স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

বঙ্গেশ্বর কুতব সা, হেমন্ত প্রভাবতীর প্রধান সহায় ছিলেন, এজন্য দুরাত্মা কৃষ্ণ তাঁহাদিগের কিছুই করিতে পারিয়া ছিল না, কুতব সাহের নিধনে কৃষ্ণ সুবিধা পাইয়া আপন মনোরথ পূর্ণ করিবার জন্য অদ্য নিশীথ সময়ে এই উদ্যানে আসিয়াছিলেন, কুসুমকে গবাক্ষ নিকটে দেখিয়া অগ্রসর হইতে পারে নাই। এখন সুযোগ পাইয়া গৃহের নিকট আসিয়া রুদ্ধ দ্বারে আঘাত করিতে লাগিল, সেই শব্দে হেমন্তের নিদ্রাভঙ্গ হইল; কিছুক্ষণ স্থিরভাবে থাকিয়া জিজ্ঞাসিলেন "কেও ?" বাহির হইতে উত্তর পাইলেন "জীন মহম্মদ !"

হেম। কেন হে?

কৃষ্ণ। কোন বিশেষ কার্য্যের জন্য উজীর মীর মামুদ আপনাকে সত্বর আহ্বান করিতেছেন। রাত্রি শেষ হইয়াছে, গা তুলুন।

হেমন্ত মীর মামুদের সহিত বিশেষ পরিচিত ছিলেন পূর্ব্বদিন কুতব সাহেব সমরশয়নের পর সেব আফগান সম্বন্ধে কি কর্তব্য সে বিষয়ে তাঁহার সহিত পরামর্শ করিবার কথা ছিল। তাহার যুক্তির জন্য মীর মামুদ তাঁহাকে সত্য সত্যই আহ্বান করিতেছেন মনে করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং প্রভাবতীকে জাগ্রত করিলেন। প্রভাবতী চক্ষু মুছিতে মুছিতে উঠিয়া বসিলেন, বসিয়া দেখিলেন, হেমন্ত সসজ্জ, কোথাও যাইবেন।

প্রভা। কোথাও যাবে নাকি?

হেম। উজীর মীর মামুদ ডাকিয়াছেন।

প্রভা। এত ভোরে?

হেম। বোধ হয় কোন বিশেষ প্রয়োজন আছে।

প্রভা। যাওয়া হবে না।

হেম। কেন?

প্রভা। যেন আমার কি সর্ব্বনাশ হইবে! প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতেছে, দক্ষিণাঙ্গ স্পন্দিত হইতেছে, সর্ব্ব শরীর অবশ হইয়া আসিতেছে, যেন তোমায় আর দেখিতে পাইব না।

হেম। কেন এরূপ অনর্থক চিন্তা করিতেছ! প্রভাত হইতেছে, এক জন রণকুশল রক্ষী জানমহম্মদ সঙ্গে যাইতেছে; আমাদিগের সমক্ষে স্বয়ং কৃতান্তও আসিতে সাহসী হইবে না।

প্রভা। এত সৈন্য সামন্ত থাকিতে তবে বঙ্গেশ্বর কুতব শা কেন নিহত হইলেন?

হেম। সে কেবল তাঁহার অসাবধানতায়।

প্রভা। যাই হোক আমি যাইতে দিব না।

হেম। তুমি লেখা পড়া জানিয়াও যে সামান্য স্ত্রীলোকের মত কথাবার্ত্তা কহিতেছ! শয়ন কর, আমি আসি।

এই বলিয়া দারোদ্ঘাটন করিয়া বাহির হইলেন, এবং ছদ্মবেশধারী কৃষ্ণচন্দ্রকে চিনিতে না পারিয়া বরাবর তাহার সঙ্গে যাইতে লাগিলেন, এখানে প্রভাবতীর মনে সন্দেহ হওয়ায় তিনি পুরুষের বেশ ধারণ পূর্ব্বক হেমন্তের পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন, কিন্তু হেমন্ত কিম্বা কৃষ্ণ তাহার কিছুই জানিতে পারিল না। ক্রমে প্রভাবতী দূরে এক মনুষ্য মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন, কিন্তু হেমন্ত যে পথে যাইতেছেন তাহার বামভাগের রাস্তায় সেই ব্যক্তি হেমন্তের বাসার দিকে আসিতেছে, তজ্জন্য হেমন্তের সহিত সাক্ষাৎ হইবার কোন উপায় নাই; মনুষ্যমূর্ত্তিকে দেখিয়া প্রভাবতী মনে করিলেন,

এ ব্যক্তি কে এবং কি জন্য আমাদের বাসাভিমুখে গমন করিতেছে। এইরূপ ভাবিয়া বক্রপথ অবলম্বনপূর্ব্বক সে ব্যক্তির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন এক জন সৈনিক পুরুষ, প্রভাবতী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি কি জন্য এ দিকে গমন করিতেছেন?

সৈনি। হেমন্তকুমারকে আনিতে যাইতেছি।

প্রভা। আপনার নাম কি?

সৈনি। জান মহম্মদ।

প্রভা। কাহার আজ্ঞায় যাইতেছেন?

সৈনি। উজীর মীর মহম্মদের হুকুমে।

প্রভা। সর্ব্বনাশ উপস্থিত, আপনি শীঘ্র আমার সহিত আসুন।

সৈনি। কি হইয়াছে বলুন দেখি।

প্রভা। বলিবার সময় নাই, আপনি শীঘ্র আমার সহিত আসুন নতুবা হেমন্তকুমার শত্রুহস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন দিবেন।

সৈনি। (প্রভাবতীর সহিত দ্রুতপদে গমন করিতে করিতে) কি ঘটনা শীঘ্র বলুন?

প্রভা। এই মাত্র কোন ছদ্মবেশী আপনার বেশ ধারণ করিয়া হেমন্তকুমারকে ডাকিয়া লইয়া গেল। কিন্তু আমার মনে পূর্ব্ব হইতেই সন্দেহ হইয়াছিল, অনেক নিষেধ করিলাম কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত না

করিয়া সেই ছদ্মবেশীর সহিত গমন করিলেন। কিন্তু আমার মনে সন্দেহ হওয়ায় আমি পশ্চাদ্গমন করিতে ছিলাম পথে আপনার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় সমস্ত ঘটনা জানিতে পারিলাম।

সৈনি। তবে শীঘ্র চলুন, কি জানি কোন দুষ্ট কি জন্য এরূপ কার্য্য করিয়াছে তাহা জানিতে পারিতেছি না।

এই বলিয়া উভয়ে দ্রুতপদে গমন করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বে জান মহম্মদের সহিত কথা বার্ত্তা বলিতে হেমন্ত প্রভাবতীর চক্ষের অন্তরাল হইয়াছেন, কাজেই অনিশ্চিত পথানুসরণ করিয়া তাঁহাদিগকে যাইতে হইতে ছিল। কিছুদূর গিয়া দেখিতে পাইলেন, যেন দুইজনে মল্লযুদ্ধ করিতেছে। তখন প্রভাবতী জান মহম্মদকে কহিলেন, দেখুন সম্পূর্ণ বিপদ উপস্থিত আমার বোধ হয় কোন দুরাশয় হেমন্তের প্রাণনাশে উদ্যত হইয়াছে।

জান। আপনার কোন ভয় নাই, আমি শীঘ্র উহার প্রতিবিধান করিতেছি।

এই বলিয়া রণদক্ষ জান মহম্মদ অতি দ্রুতবেগে সেই মল্লযুদ্ধের স্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং দেখিলেন এক ব্যক্তি হেমন্তকুমারের বুকের উপর উপবিষ্ট হইয়া এক তীক্ষ্ণধার ছুরিকা দ্বারা তাহার বক্ষে আঘাত করিবার উদ্যোগ করিয়াছিল, কিন্তু জান মহম্মদকে দেখিয়া

ভীত হইয়া পলায়নের চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু হেমন্ত তাহাকে এরূপ ভাবে ধরিয়াছেন যে তাহার পলাইবার কোন উপায় নাই। জান মহম্মদ যাইয়াই সে ব্যক্তির ছোরা কাড়িয়া লইল এবং হেমন্তের বুক হইতে নামাইবা মাত্র হেমন্ত উঠিয়া পড়িলেন। তখন সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া উভয়ে কৃষ্ণকে বন্ধন করিতেছে এমন সময় প্রভাবতীও তথায় উপস্থিত হইলেন। তখন জান মহম্মদ হেমন্তকে ভৎর্সনা করিয়া কহিলেন, যেরূপ মূর্খের ন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহাতে আপনার এখনি প্রাণ নাশ হইত কিন্তু ঈশ্বর ইচ্ছায় আজ আপনি পুনর্জীবন প্রাপ্ত হইলেন তজ্জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিল। প্রভাবতী এইসব কাণ্ড দেখিয়া একবারে কাষ্ঠপুত্তলিবৎ দণ্ডায়মান, মুখে কথা নাই। হেমন্ত প্রভাবতীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। তুমি কিরূপে জানিতে পারিলে।

প্রভা। আমি তোমাকে পূর্ব্বেই নিরস্ত করিয়াছিলাম কিন্তু তুমি সে কথা গ্রাহ্য না করিয়া এই নরপিশাচ কৃষ্ণের সঙ্গে এখানে আসিলে কিন্তু যদি আমরা না জানিতে পারিতাম তবে এতক্ষণ কি হইত বল দেখি?

হেম। ঈশ্বর আছেন, তিনিই রক্ষাকর্ত্তা।

প্রভা। (হেমন্ত ও জানমহম্মদকে লক্ষ্য করিয়া) এ দুর্দ্দান্ত নরঘাতককে আর এখানে রাখিবার দরকার কি; ইহাকে উজির সাহেবের নিকট লইয়া যাও।

প্রভাবতীর কথা শুনিয়া জান মহম্মদ ও হেমন্ত, কৃষ্ণ চন্দ্রকে লইয়া শিবিরাভিমুখে চলিয়া গেলেন। প্রভাবতী বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। যখন কৃষ্ণকে শিবিরে লইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত উজীরকে বলিলেন। উজীরসাহেব ক্রোধান্ধ হইয়া কৃষ্ণের প্রাণদণ্ডের হুকুম দিলেন। তৎক্ষণাৎ উহা কার্য্যে পরিণত হইল। ক্ষণেক পরে কুমার ভূপেন্দ্র নারায়ণ সসৈন্যে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। উজীর মিরমামুদ বড় সমাদর করিয়া তাহাকে বসাইলেন। ক্রমে হেমন্তের সহ আলাপ হইল এবং তাহা কর্ত্তৃক কুমারের জীবন রক্ষা হইয়াছিল, অনুচর কর্ত্তৃক তাহা প্রকাশিত হইল, কুমার হেমন্তকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। পরে উজীর সাহেব হেমন্ত ও কুমার ভূপেন্দ্রকে লইয়া শের আফগানকে কিরূপে পরাজিত করা যায় তাহার পরামর্শ করিয়া সমুদয় সৈন্যকে যুদ্ধার্থে অনুমতি প্রদান করিলেন। ঘোরতর যুদ্ধের পর শের আফগান নিহত হইল। যুদ্ধ অবসানে উজীর হেমন্ত ও কুমার ভূপেন্দ্রের যথেষ্ট ধন্যবাদ ও প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এইরূপে নানাপ্রকার [illegible] চারি পাঁচ দিন অতীত হইয়া গেল পরে হেমন্ত উজীর সাহেবের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু উজীর সাহেব হেমন্তকে এক দণ্ডের জন্য ছাড়িতে চাহেন না, তজ্জন্য তিনি বলিলেন, এক্ষণে আর [illegible] আমিও আপনার সহিত

আলাটী যাইব। হেমন্তকুমারকে অগত্যা তাহাই স্বীকার করিতে হইল। দিন কয়েক পরে বর্দ্ধমানের কার্য্য শেষ করিয়া আলাটী যাত্রা করিলেন। প্রভাবতীর আগমনে রাজা অনন্ত সুখী হইলেন ও হেমন্তকুমারকে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। পরে মহা সমারোহে হেমন্তকুমারের সহিত প্রভাবতীর বিবাহ হইল। এবং কুমার ভুপেন্দ্রনারায়ণের সহিত তিলোত্তমার বিবাহ হইল। কুসুমকুমারীও হেমন্তের সহিত আলাটী গিয়াছিলেন, বিবাহকার্য্য শেষ হইলে তিনি ঈশ্বর উপাসনার জন্য কাননাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এইরূপে হেমন্তকুমার পরম সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। দিল্লীর বাদসাহ হেমন্ত এবং কুমার ভুপেন্দ্রের কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া বহুতর জায়গির প্রদান করিলেন। এইরূপে হেমন্তকুমার কখন মুর্শিদাবাদে কখন বা আলাটী গ্রামে থাকিয়া পরম সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। দুঃখের মধ্যে কুসুমের জন্য সর্ব্বদাই আক্ষেপ করিতেন। যে হেতু, ঈশ্বর মনুষ্যকে সর্ব্বসুখ প্রদান করেন না। তাহার উপমা এইমাত্র যে মনোহর কমল পুষ্পের সমস্ত সুন্দর কিন্তু বিধাতা উহার মৃণাল কণ্টকময় করিয়াছেন।

সমাপ্ত।